আনন্দমেলা

৩ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫ • আনন্দবাজার-প্রকাশন • ২/-

আনন্দমেলা

তোমাদের মনের মতো রঙিন পূজাবার্ষিকী

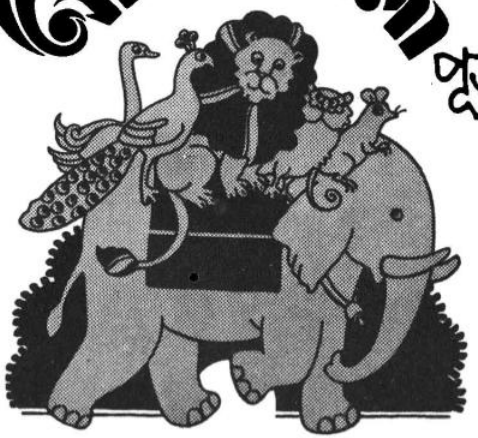

বিশেষ আকর্ষণ

অবনীন্দ্রনাথের
অপ্রকাশিত রচনা

শিশিরকুমার বসুর
আমরা নেতাজীর ক্যাডেট

রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র
শমীন্দ্রনাথের
অপ্রকাশিত চিঠি

গোয়েন্দা রিপের
সুবিশাল চিত্রকাহিনী
"হারানো মেয়ে"

উপন্যাস

সত্যজিৎ রায়
(সুবিশাল রহস্য-কাহিনী)
আশাপূর্ণা দেবী
সমরেশ বসু
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
শৈলেন ঘোষ

বড়গল্প

বিমল মিত্র
বিমল কর
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

পরীক্ষার্থীদের জন্য

হেড এগজামিনারের
কী করে নম্বর বাড়াতে হয়

অন্নদাশঙ্কর রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুনির্মল বসু, বিমল ঘোষ (মৌমাছি), সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সন্তোষকুমার ঘোষ, শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও আরও অনেকের ছড়া।

তাছাড়া বিখ্যাত লেখকদের প্রচুর গল্প, ভ্রমণকাহিনী, ধাঁধা এবং আরও অজস্র আকর্ষণ।

দাম ১৬.০০ টাকা
রেজিস্ট্রীডাকে ১৮.৯০

ফটো টাইপ সেটিং
পদ্ধতিতে
অফসেটে ছাপা
অনবদ্য লেখায় ঠাসা
পূজাবার্ষিকী

তোমার কপির জন্যে এখনই এজেন্টকে বলে রাখো বা আমাদের লেখো: সিনিয়র সার্কুলেশন ম্যানেজার আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, কলিকাতা-৭০০ ০০১

AAM/CAS-1/81 BEN

আনন্দমেলা

২৩ ভাদ্র ১৩৮৮ • ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৮১ • ৭ বর্ষ • ১১ সংখ্যা

বিশেষ রচনা

প্রতিবন্ধীদের কথা ও কাহিনী। আশিস দেব রায় ৪

গল্প

হরিপদবাবুর বিপদ। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ১২
পট-জিওনের জাদুকর। অনিরুদ্ধ কর ৩৬
হারু। তাপস গঙ্গোপাধ্যায় ৫৫

উপন্যাস

সিসের আঙটি। বিমল কর ২৩
হারানো কাকাতুয়া। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ৫১

স্মৃতিকথা

বসু-বাড়ি। শিশিরকুমার বসু ১৭

ছড়া

পদ্য লিখেছি। অমলকান্তি ঘোষ ৪৯

খেলোয়াড়ের আত্মকথা

উইং থেকে গোল। পি. কে. ৪৭

চিত্রকাহিনী ও কমিক্‌স

সদাশিব ২৮, রোডার্সের রয় ৩০, টিনটিন ৩২
টারজান ৬০, গাবলু ৬১, বাঘা ৬৫

লেখাপড়া

বাংলা বলো। বাচস্পতি ৬২
সহজে ইংরেজি। প্রসাদ ৬৩

খেলাধুলো

ক্রিকেটের অঘটন। শ্যামসুন্দর ঘোষ ৪৩
মজার মানুষ 'বিশ'। রাজু মুখোপাধ্যায় ৪৫

অন্যান্য আকর্ষণ

ছবির মজা ২১, ধাঁধা-মজা-রহস্য ৩৪
তোমাদের পাতা ৩৯, আঁকো-শেখো ৬৬
ইয়ান বথামের পুরোপাতা রঙিন ফোটো ৪১

প্রচ্ছদ : নিখিল ভট্টাচার্য

সম্পাদক : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বাপ্পাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড পি ২৪৮ সি আই টি রোড কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত। দাম দু' টাকা

বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ৫ পয়সা। পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ১০ পয়সা
পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা।

বাঁয়ের পাতার বিজ্ঞাপনটি পড়ো। তারপর দ্যাখো ৫৩ পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপনটি। তাহলেই বুঝবে যে, এবারকার আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকীর সত্যিই কোনো তুলনা নেই। আর-একটা কথা, গতবারে তো আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকী বেরুতে দেরি হয়েছিল, এবারে একটুও দেরি হবে না। পূজার অনেক আগেই পূজাবার্ষিকী বেরুবে। বাড়িতে যিনি কাগজ দেন, তাঁকে বলে রাখো। মোট কথা, এবারকার আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকী তোমার চাই-ই চাই।

প্রতিবন্ধীদের কথা ও কাহিনী

আশিস দেবরায়

রঙ [illegible]। ভাল স্বাস্থ্য, চেহারা সুন্দর, বয়স বছর-বারোর বেশি হবে না। মেয়েটির নাম মিঠু কাপুর। খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে। ইংরেজি মিডিয়ামে পড়াশোনায় অনেক এগিয়ে গেছে। এখন চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ে। সেরিব্রাল পল্‌সি হওয়া সত্ত্বেও নিষ্ঠার সঙ্গে পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছে। ল. সা. গু., গ. সা. গু.'র অঙ্ক, মেট্রিক প্রণালী, ইংরেজি, ইতিহাস, ভূগোল, পরিবেশ-বিজ্ঞান—সবকিছুই যে-কোন সাধারণ ছেলেমেয়ের চাইতে সে কম জানে না। ভালভাবে হাত ব্যবহার করতে পারে না বলে হেড-পয়েন্টার নামে মাথার সঙ্গে লাগানো যন্ত্রের সাহায্যে লেখাপড়ার কাজ করে। আর ওই কেমন নাদুসনুদুস সুস্বাস্থ্যের ভারী মিষ্টি চেহারার যে-ছেলেটি কাঠের বানানো সিঁড়িতে ধাপে ধাপে ওপরে ওঠানামা অনুশীলন করছে, নাম অর্জুন কল। বয়স তারও প্রায় বারো। চলনে ও অঙ্গভঙ্গিতে গোলমাল থাকা সত্ত্বেও ফিজিওথেরাপির চেষ্টায় এখন সে অনেকটা হাঁটতে পারে। একটু একটু করে নিজের পায়ে সে বল পাচ্ছে।

এ তো গেল মিঠু ও অর্জুনের কথা, কিন্তু রাজা আর জিজা? ওদের কথাও বলতে হয়। রাজা সেনের বয়স এই তেরো। খুব সপ্রতিভ। এই সেদিন সে বাড়িতে বসে টিভিতে মোহনবাগান-মহামেডানের এ-বছরের প্রথম প্রদর্শনী ফুটবল খেলাটি দেখেছে। ফুটবল ছাড়াও সে ক্রিকেট সম্পর্কে উৎসাহী। আর এগারো বছরের জিজা ঘোষও খুব ফুটফুটে মেয়ে। সে বড় হয়ে লেখক হতে চায়। ছোটদের জন্যে তার গল্পের বই লেখার ইচ্ছে। জিজা ও রাজা দুজনই মোহনবাগানের ভক্ত—উলাগানাথন ও জেভিয়ার পায়াসের খেলা ওদের ভাল লাগে। আর ক্রিকেটে সুনীল গাভাসকার ও কপিলদেবের খেলা। রাজা বড় হয়ে দেশের সেবা করতে চায়। একজন অভিজ্ঞ শিক্ষকের অধীনে এখন দুজনেই স্পষ্টভাবে

ইলেকট্রিক টাইপরাইটারের সাহায্যে পড়াশুনো

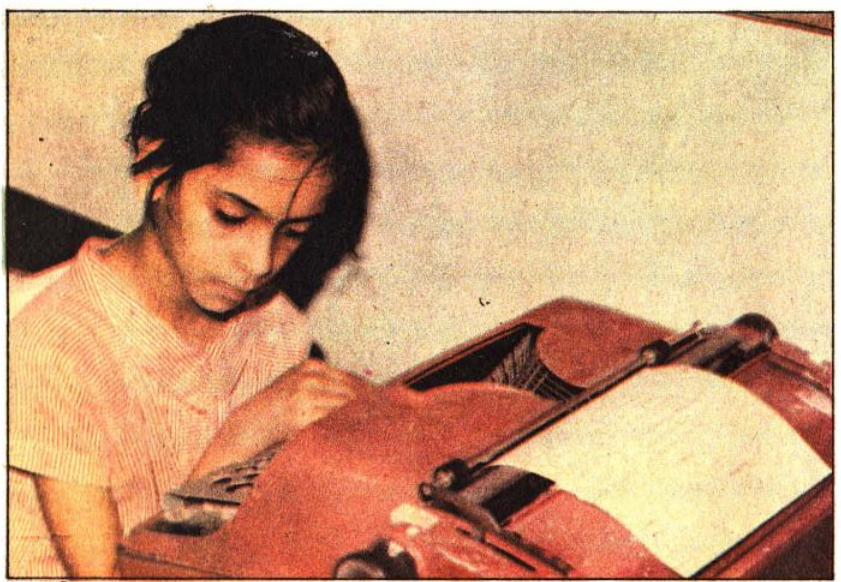

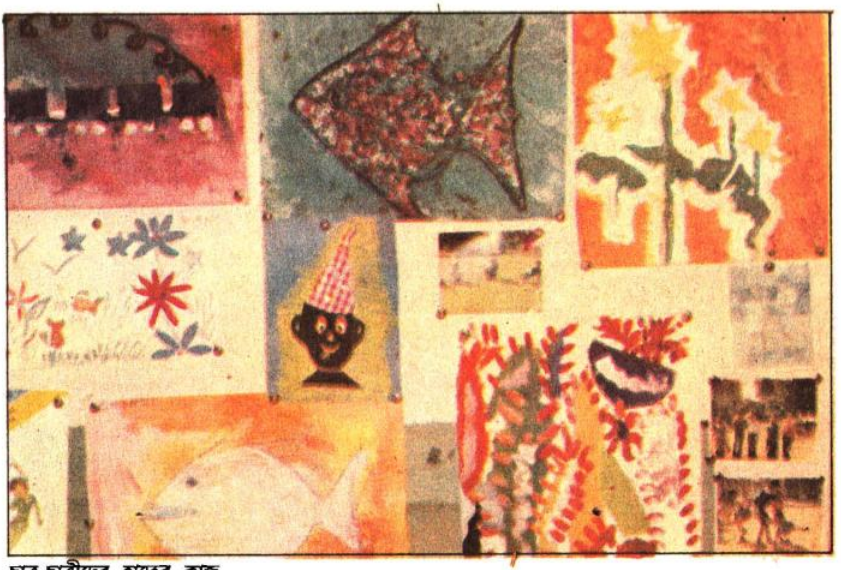

ছাত্র-ছাত্রীদের হাতের কাজ

কথা-বলার চর্চা করছে। শুধু কথা-বলাই নয়, রাজা বুক-ভরা সাহস নিয়ে বলল, "আমরাও একদিন প্রমাণ করব যে, আমাদের মতো প্রতিবন্ধীরাও ভালভাবে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে যেতে পারে।"

দিনকয়েক আগে মিঠু কাপুর, রাজা সেন ও জিজা ঘোষ কলকাতার নামকরা স্কুলের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে এক প্রশ্নোত্তরের আসরে যোগ দিয়ে কোয়ার্টার ফাইনাল অবধি এগিয়ে গিয়েছিল।

কৌশিক ব্যানার্জিও পড়াশোনায় মিঠু বা রাজার চাইতে পিছিয়ে নেই। সে যদিও হাতে লিখতে চেষ্টা করছে, তবে সে-লেখা স্বাভাবিক নয়—বেশ জড়ানো। তাই সে ইলেকট্রিক টাইপরাইটারের সাহায্যে লেখা অনুশীলন করছে। পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী খুশি হয়ে ওকে এমন একটি টাইপরাইটার দিয়েছেন। এবার চলো অদ্ভুত চালাকচতুর দশ বছরের ছেলে জাগরণ চ্যাটার্জির কাছে। সে যে শুধু ভাল ছবি আঁকতে পারে তাই নয়, অভিনয়ও করে চমৎকার। সম্প্রতি এক নাটকে সে পিটার প্যানের ভূমিকায় অভিনয় করেছে। ছবি-আঁকার প্রতিযোগিতায় সে প্রাইজ পায়।

ধীর-স্থির, শান্ত মেয়ে পুতুল বিশ্বাস হাঁটতে পারে না, হাতের ব্যবহারও তার ঠিকমতো হয় না। নিজের চেষ্টায় ও মায়ের সাহায্যে এখন নিজের হাতে ভাত খেতে পারে। সে ব্লিস সিম্বল বোর্ডের সাহায্যে পড়াশোনা চালায়, কথাও বলতে পারে। লেখাপড়ায় অদম্য উৎসাহ। বাংলা, অঙ্ক, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় নিয়ে সে পড়ছে।

এমনই প্রায় ৭০টি ছেলেমেয়ে নিয়ে বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের মিলিটারি ক্যাম্পে অবস্থিত 'দি সেন্টার ফর স্পেশাল এডকেশন' নানান রকমের অনুশীলন করছে। ওই ছেলেমেয়েদের মধ্যে কেউ স্বাভাবিক হাঁটার, কেউ সঠিকভাবে কথা বলার চেষ্টা করছে। সেই সঙ্গে অনেকে আবার পড়াশোনাও চালিয়ে যাচ্ছে। সাধারণভাবে বলা যায়, নার্সারি থেকে উপস্থিত পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত এখানে পড়াশোনা হচ্ছে।

যে ছেলেমেয়ের সেরিব্রাল পল্‌সি আছে তাকে স্প্যাসটিক বলা হয়। স্প্যাসটিকদের চলন ও অঙ্গভঙ্গিতে গোলমাল থাকে। এককথায় ওরা প্রতিবন্ধী। সারা ভারতে প্রায় ১০ লক্ষের মতো স্প্যাসটিক প্রতিবন্ধী আছে। বছরে প্রায় ৯ হাজার স্প্যাসটিক শিশু (অর্থাৎ প্রতি দিনে ২৪টি) আমাদের দেশে জন্মগ্রহণ করছে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে আনুমানিক ৮৪,০০০ স্প্যাসটিক আছে। সম্প্রতি

প্রতিবন্ধী ভাইবোনদের পাশে
আমরা ছিলাম আছি থাকবো
Nias/813
সঞ্চয়নী সেভিংস এ্যাণ্ড ইনভেস্টমেণ্ট (ইণ্ডিয়া) লিঃ
রেজিঃ অফিস ৮২/২এ, বিধান সরণী, কলিকাতা-৭০০০০৪ ফোন নং ৫৫-৫০১৭

'পশ্চিমবঙ্গ প্রতিবন্ধী সমিতি' ও 'অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব হাইজিন অ্যাণ্ড পাবলিক হেলথ' যুগ্মভাবে চেতলা ও সিউড়িতে স্প্যাসটিক বিষয়ে সমীক্ষা শুরু করেছেন। মস্তিষ্কের একটি ছোট্ট জায়গা থেকে শরীরের সঞ্চালন-ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয়, সেখানে কোনো ক্ষতি বা স্বাভাবিক বিকাশে বিঘ্ন ঘটলে বাচনভঙ্গিতে, চলনভঙ্গিতে গোলমাল দেখা দেয়। এই স্কুলের যে-কোনো দুটি ছেলেমেয়ে কিন্তু একরকম নয়। যারা মৃদু আক্রান্ত তাদের অক্ষমতা অল্প। যারা বেশিরকম প্রতিবন্ধী তাদের হাঁটাচলা অস্বাভাবিক—হাত নাড়তে বা কথা বলতেও অসুবিধা হয়। এমনও অনেকে আছে যারা নিজে থেকে দাঁড়াতে বসতে বা কিছু করতে পারে না। আবার কিছু ছেলেমেয়ে শুধু যে স্প্যাসটিক তা নয়, তাদের হয়তো বধিরতা বা অন্য কোনো কঠিন সমস্যাও রয়েছে।

সেরিব্রাল পল্‌সি কিন্তু কোনো রোগ নয়। বংশগত বা সংক্রামকও নয় এটা। মাতৃজঠরে বা জন্মের সময় কোনো আঘাত বা কঠিন অসুখে জীবনের শুরুতে কোনো ক্ষতি হলে এমনটি হয়। এদের মধ্যে গড়ে প্রায় ৫০ শতাংশ ছেলেমেয়েই কিন্তু সাধারণ থেকে বেশি বুদ্ধি ধরে। স্কুলের পড়াশোনা বা যে-কোনো বিষয় বেশ তাড়াতাড়ি এরা বুঝে নিতে পারে।

এইসব শিশুদের শারীরিক ও মানসিক উন্নতির জন্যে ১৯৭৪ সালে মে মাসে কলকাতায় স্থাপিত হয় ওয়েস্ট বেঙ্গল স্প্যাসটিক সোসাইটি। অবশ্য 'দি স্প্যাসটিক সোসাইটি অফ ইণ্ডিয়া'র তত্ত্বাবধানে বোম্বে, দিল্লি ইত্যাদি শহরেও এই জাতীয় বিশেষ শিক্ষাকেন্দ্র আছে। পূর্বভারতে এ-ধরনের একমাত্র প্রতিষ্ঠান এই সোসাইটি। এই সোসাইটি পরিচালিত 'দি সেণ্টার ফর স্পেশাল এডুকেশন'-এ প্রতিটি স্প্যাসটিক শিশুর সমস্যা বিশেষভাবে আলোচনা করে তাদের ভবিষ্যৎ-অনুশীলনের ব্যবস্থা করা হয়। কমপক্ষে তিন বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের প্রথমে খেলাধুলো ও ছবির মাধ্যমে পড়াশোনা শুরু করানো যায়। ক্রমশ এদের প্রাথমিক শিক্ষা, দৈনন্দিন জীবনযাপন, ছবি-আঁকা, কারিগরি বিদ্যা, নিজের পায়ে দাঁড়ানো ইত্যাদি বিষয়ে তালিম দেওয়া হয়। এরা পড়াশোনায় যেমন এগিয়ে যায়, তেমনি ধীরে ধীরে দৈনন্দিন জীবনে নানান সমস্যার মোকাবিলা করার সাহস ও ক্ষমতা পেতে থাকে। স্বাভাবিক চলন-বলনের সীমাবদ্ধতায় এরা হাঁটতে লিখতে বা কথা বলতে অসুবিধা বোধ করে। তাই বিশেষ ইলেকট্রিক টাইপরাইটার দিয়ে লেখা, মস্তিষ্কে লাগানো হেড-পয়েণ্টার দিয়ে পড়া বা টাইপ করা, ভাষাপ্রণালীর বোর্ড বা ব্লিস সিম্বল

বিদেশিনী এক প্রতিবন্ধী

বোর্ড দিয়ে কথা বলা, বা রোলেটার দিয়ে হাঁটা ইত্যাদির অনুশীলন দেওয়া হয়। ফিজিওথেরাপি ও স্পিসথেরাপির সাহায্যে দক্ষ শিক্ষক-শিক্ষিকারা এদের শারীরিকভাবে সুস্থ করা, কথা বলানো ও মানসিক উন্নতির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

এই সেণ্টারের শিশুদের মধ্যে শতকরা ৮০ জন সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের। পড়াশোনা

ক্যান্টিনে ছাত্র-ছাত্রীরা

শেখানো ও থেরাপি চিকিৎসা ছাড়া এদের যে নানান কারিগরি শিক্ষা দেওয়া হয়—তার মধ্যে রয়েছে চক তৈরি, মাটি দিয়ে মডেল বানানো, 'টাই ও ডাই' জাতীয় বাটিকের কাজ, মোমবাতির স্ট্যাণ্ড ও কোট-হ্যাঙ্গার তৈরি ইত্যাদি। তাছাড়া রান্না-বান্নাও শেখানো হয়। নিজে একজন প্রতিবন্ধী হয়েও বি. এ. পাস শ্যামশ্রী মিশ্র চন্দননগর থেকে এসে এখানে রন্ধনশিল্পে শিক্ষকতা করেন। তাঁর পরিচালনায় ছাত্র-ছাত্রীরা অরেঞ্জ জুস, লাইম শরবত, টমেটো স্যাণ্ডউইচ, ডিমের ডালনা, সুজি হালুয়া, আলুভরতা, এমনি অনেক কিছু তৈরি করার পদ্ধতি শিখে নিচ্ছে।

এই সোসাইটির বিশেষ শিক্ষা সেন্টারটির ভাইস-চেয়ারম্যান ও প্রিন্সিপাল শ্রীমতী সুধা কলের পরিচালনায় প্রায় ২৬ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা ও বিশেষজ্ঞ স্প্যাসটিক শিশুদের সুস্থ জীবনের দিকে নিয়ে যেতে এগিয়ে এসেছেন। সব রকমের সেরিব্রাল পলসি প্রতিবন্ধী, বিশেষত যারা খুব বেশিরকমের আক্রান্ত, এমনি ৪২টি শিশুর শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও চিকিৎসার জন্যে একটি ডে-সেন্টার স্থাপন করা, বহিরাগত ৩০টি শিশুর চিকিৎসা ও প্রশিক্ষণের জন্যে বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন চিকিৎসকের সাহায্য নেওয়া, পশ্চিমবঙ্গ তথা পূর্বভারতের অন্যান্য জায়গায় রুগিদের জন্যে একটি 'আউট স্টেশন অ্যাডভাইসরি সার্ভিস'-এর ব্যবস্থা করা, মেডিকেল প্যানেল দিয়ে রুগিকে পরীক্ষা করানো ও প্রয়োজন অনুযায়ী ভিন্ন প্রতিবন্ধী প্রতিষ্ঠানে ওদের চিকিৎসা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ করে দেওয়া, কলকাতার ঘন বসতির দরিদ্র এলাকায় 'আউটডোর ট্রিটমেণ্ট ক্লিনিক' গড়ে তোলা—এমনি আরো অনেক কল্যাণমূলক কাজ তাঁরা চালিয়ে যাচ্ছেন। আগামী ২৬ নভেম্বর কলকাতায় স্প্যাসটিকের ওপর তাঁরা এক বিশ্ব অধিবেশনের আয়োজন করছেন—সেখানে বিদেশ থেকে সাতজন বিশেষজ্ঞ ছাড়াও দেশের নানা প্রান্ত থেকে প্রতিনিধি আসার কথা। কেন্দ্রীয় সরকারের কিছু সাহায্য ছাড়াও তাঁরা কলকাতার সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান বা হিতাকাঙ্ক্ষীদের সক্রিয় সহযোগিতায় আর সেণ্টারের ছাত্র-ছাত্রীদের বানানো জিনিসপত্রের প্রদর্শনী করে তহবিল গড়ে তুলেছেন। তবে প্রয়োজনের তুলনায় এখনো তা যথেষ্ট নয়। সোসাইটির নিজস্ব বাসভবন তৈরির জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার জমি দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

স্প্যাসটিক প্রতিবন্ধী ছাড়াও আরো অসংখ্য ধরনের প্রতিবন্ধী আছে। আমাদের দেশে

শিশুদের মধ্যে অন্তত ২০ লক্ষ জড়বুদ্ধি। ৯ লক্ষ অন্ধ। ৫ লক্ষ বিকলাঙ্গ এবং ৩ লক্ষ মূক-বধির। এই দুর্ভাগ্যের জন্যে তারা নিজেরা তো দায়ী নয়, তাই তাদের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করার সামাজিক দায়িত্ব আমাদের সবাইকে নিতে হবে বৈকি। সমাজের এই বঞ্চিত শ্রেণীর সমস্যার গুরুত্ব প্রতি মানুষের সামনে তুলে ধরতে ও তাদের উন্নতিকল্পে আমাদের সচেতন করে তুলতে ১৯৮১ সালকে রাষ্ট্রসংঘ 'বিশ্ব-প্রতিবন্ধীবর্ষ' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। বিশ্ব-প্রতিবন্ধীবর্ষের থীম বা প্রধান ভাবটি হল—পূর্ণ সহযোগিতায় ও সমদর্শিতায় চারিদিকে ছড়িয়ে থাকা প্রতিবন্ধী মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে আমাদের একাত্ম হওয়া। এই গুরুদায়িত্ব পালন করতে কলকাতাবাসীরা হয়তো পিছিয়ে নেই। 'দি সেণ্টার অফ স্পেশাল এডুকেশন'-এর মতো আরো কয়েকটি সংস্থা প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও চিকিৎসার দিকে নজর দিয়েছেন। কাঁকুরগাছিতে 'অলকেন্দু বোধনিকেতন' মানসিক প্রতিবন্ধীদের কারিগরি শিক্ষা দিচ্ছেন। দক্ষিণ কলকাতার 'ইনস্টিটিউট অফ সাইকোলজিক্যাল অ্যাণ্ড এডুকেশনাল রিসার্চে মূক ও বধির প্রতিবন্ধীদের নানান প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে। বেহালায় ও রামকৃষ্ণমিশন চালিত নরেন্দ্রপুরে অন্ধদের স্কুল রয়েছে। মূক ও বধিরদের শিক্ষার জন্যে কলকাতা ছাড়াও ইছাপুরে একটি স্কুল আছে। অস্থি-বিকলাঙ্গদের জন্য কলকাতায় একটি 'ন্যাশনাল ইনসটিটিউট' স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া আছে প্রতিবন্ধীদের কর্মসংস্থানের জন্যে এক 'ভোকেশনাল রিহ্যাবিলিটেশন সেণ্টার'।

বিশ্ব-প্রতিবন্ধীবর্ষের আর-এক উদ্দেশ্য হল প্রতিবন্ধীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। প্রতিবন্ধীদের উপযুক্ত কাজ পেতে নিয়োগ-বিনিময়কেন্দ্রগুলিকে আমাদের অবশ্যই আরো বাড়াতে ও জোরদার করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ এ-ব্যাপারে কয়েকটি কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। প্রতি জেলায় তাদের প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান ও কিছু আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া আছে কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও যন্ত্রাদি প্রদান, সরকারি আবাসের সম্প্রসারণ, বৃত্তিমূলক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন, অক্ষমতাভাতা প্রদান, অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ুয়াদের বৃত্তিপ্রদান, দক্ষ প্রতিবন্ধী কর্মী ও বিশিষ্ট বেসরকারি কর্মদাতা সংস্থাকে পুরস্কার প্রদান। আর আছে প্রতিবন্ধ-নিবারণে চলচ্চিত্র নির্মাণ ও অন্যান্য মাধ্যমে তার প্রচার এবং শিশুপুষ্টি প্রকল্প রূপায়ণ ইত্যাদি। সম্প্রতি ভারতের রাষ্ট্রপতি কলকাতার বেঙ্গল পটারিজ-এর মূক ও বধির কর্মী শ্রীমতী ঝুমা রায়কে প্রতিবন্ধী কর্মীর

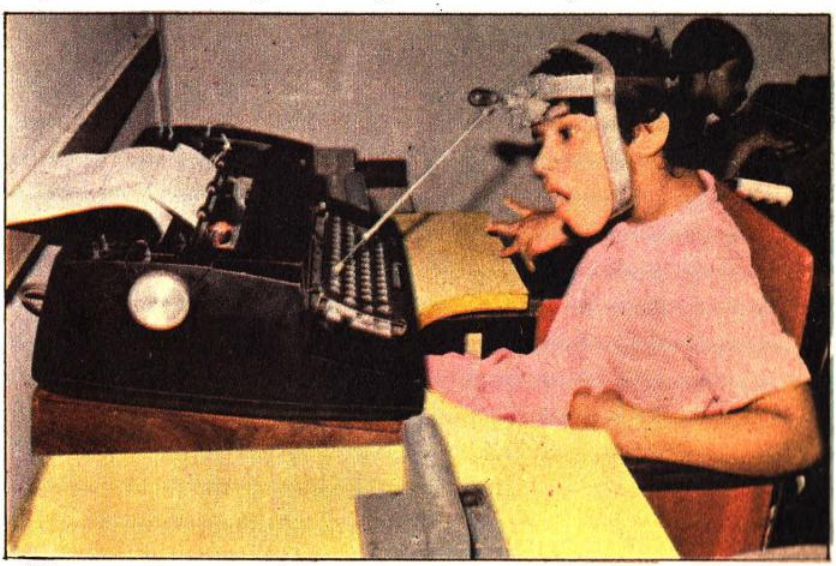

ছাত্রীটি হেড পয়েণ্টারের সাহায্যে টাইপ করছে

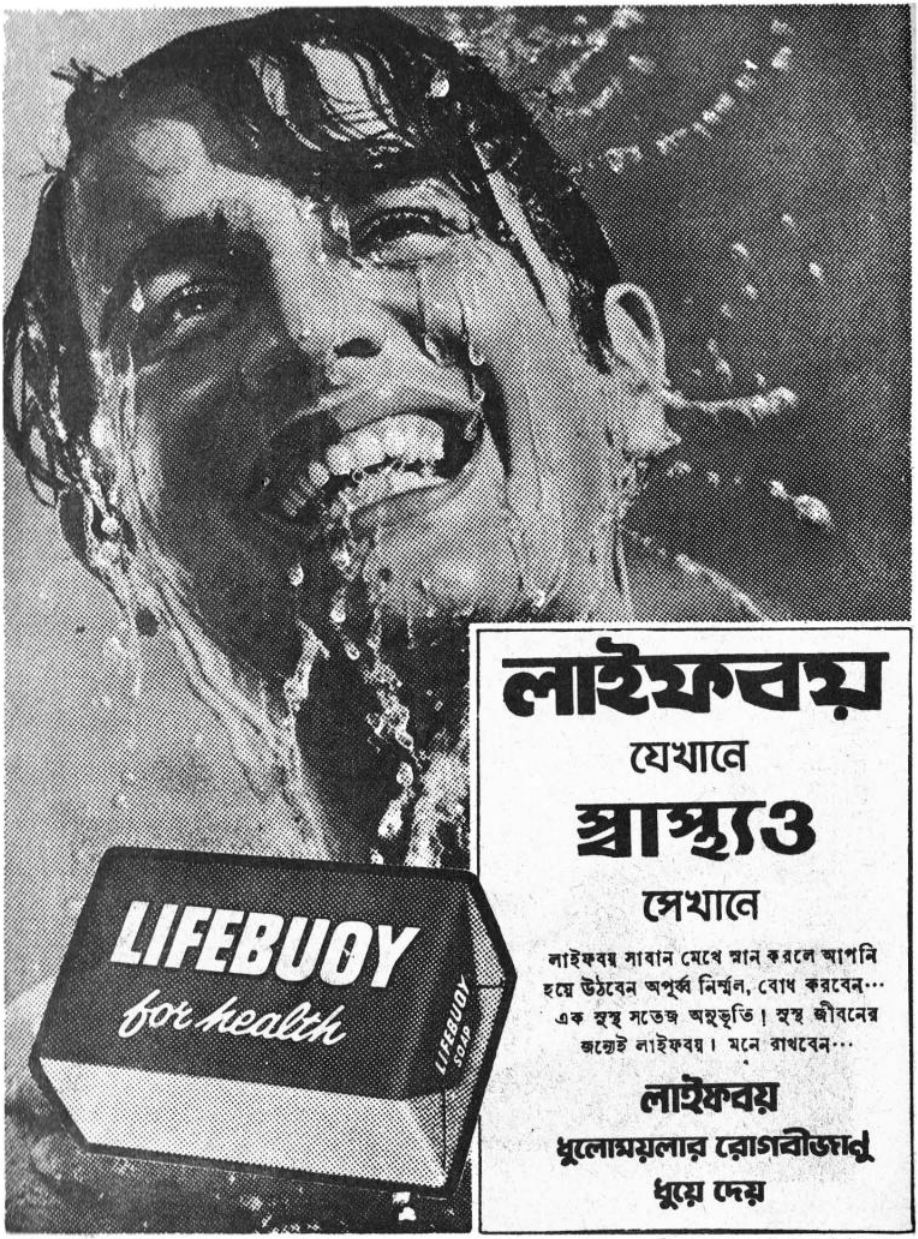

লিন্টাস-L. 75-140 BG

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

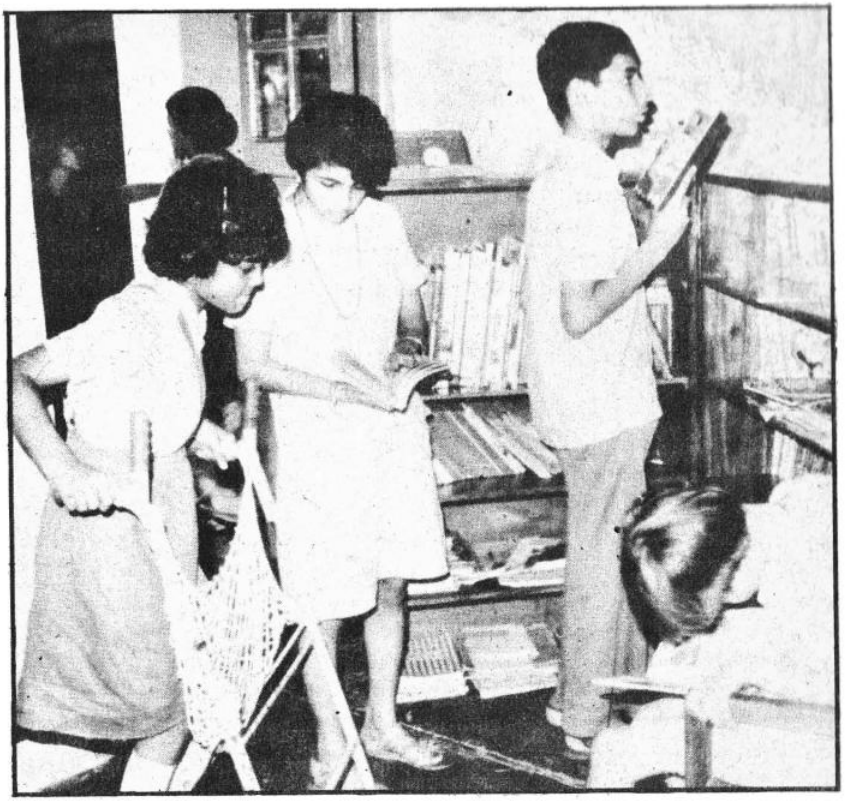

লাইব্রেরিতে ছাত্র-ছাত্রীরা

নৈপুণ্য-পুরস্কার প্রদান করেন।

একটু সাহায্য ও সুযোগ পেলে প্রতিবন্ধীরাও মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে। পৃথিবীর অনেক বিখ্যাত মানুষই তো প্রতিবন্ধী ছিলেন। আমেরিকার স্বনামধন্যা হেলেন কেলার ১৮ মাস বয়সে কঠিন অসুখে অন্ধ, মূক ও বধির হয়ে যান। সঙ্গীতশিল্পী বেটোফেন বধির হয়েও আশ্চর্য সব সুর সৃষ্টি করে গেছেন। ইংরেজ কবি লর্ড বায়রন খোঁড়া ছিলেন, আর এক জন মিলটন শেষ জীবনে অন্ধ হয়ে গিয়েও 'প্যারাডাইস রিগেনইড' নামে বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ লিখেছিলেন। আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট রুজভেলট পোলিওতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। বহু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের জনক টমাস আলভা এডিসন বধির ছিলেন। ইংরেজ সাহিত্যিক স্যার ওয়ালটার স্কট পঙ্গু ছিলেন। আমাদের দেশেও এরকম অনেক নাম উল্লেখ করা যায়। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শেষজীবনে অন্ধ হয়ে যাবার পরও সাহিত্যচর্চা করেছেন। নামকরা স্পিন বোলার চন্দ্রশেখরের ছেলেবেলায় পোলিও হয়েছিল। প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় চোখ হারিয়েও শিল্পকর্ম থেকে বিরত হননি। অন্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে-র কণ্ঠমাধুর্য কি ভোলা যায়?

দেশের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে প্রতিবন্ধীদের সংখ্যাও দিন-দিন বাড়ছে। কাজেই তাদের প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধার জন্য আজ বিশেষ সচেতনতার প্রয়োজন। আমরা সবাই যদি আত্মীয়ের উদ্বেগ ও তৎপরতা নিয়ে প্রতিবন্ধীদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে পারি, তাহলে তাদের জীবনের অসহায় শূন্যতা অনেকটা পূরণ হতে পারে।

ফোটো নিখিল ভট্টাচার্য

হরিপদবাবুর বিপদ

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

রোজ ভোরবেলা পার্কে কিছুক্ষণ বেড়ানো হরিপদবাবুর অনেককালের অভ্যাস। পার্কটা বেশ বড়। কিন্তু হাঁটাচলার পর একটুখানি যে বসবেন কোথাও, তার উপায় নেই। এখানে-ওখানে যত বেঞ্চ আছে, কখন সবগুলো ভর্তি হয়ে গেছে। ঘাসে বসারও বিপদ আছে। ছেলেপুলের যা পায়তারা, কে কখন ঘাড়ে এসে পড়ে তার ঠিক নেই। তার চেয়ে বড় বিপদ ওদের ফুটবল। যেন কামানের গোলা।

তাতেবিরক্ত হরিপদ অগত্যা নিরিবিলি দক্ষিণ-পূর্ব কোণে বকুল গাছটার দিকে যান। বকুলতলায় এক টুকরো কালো পাথর পড়ে থাকতে দেখেছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য, কখন পাথরটাও দখল হয়ে গেছে। হোঁতকা-মোটা, মাথায় টাক আর মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চ্যাপ্টা নাক, কুতকুতে চোখ নিয়ে একটা লোক আরামে বসে আছে।

যেদিনই যান, দেখেন তাঁর যাওয়ার আগে কখন লোকটা বকুলতলার আসনটা দখল করে ফেলেছে।

জায়গাটা যে এমন কিছু সুন্দর তাও নয়। একটু নিরিবিলি এই যা। ওদিকটায় বলের ঘা খাওয়ার রিস্কও নেই। তবে ওখানে বসে আর কিছু না হোক, রেলগাড়ি দেখতে পাওয়া যায়। রেলগাড়ি দেখতে ভালই লাগে হরিপদবাবুর। মনে-মনে কাঁহা-কাঁহা মুল্লুক চলে যাওয়া যায়। কু-ঝিক-ঝিক · · · কু-ঝিক-ঝিক! কখনও রেলগাড়ির চাকায় ছড়া বলে, টিকিটবাবুর কত টাকা! টিকিটবাবুর কত টাকা! ছেলেবেলার কত কথা মনে পড়ে যায়।

শেষে জেদ চড়ে গেল হরিপদবাবুর। আগেভাগে গিয়ে পার্কের বকুলতলার পাথুরে আসনটা তাঁর দখল করা চাই-ই। সেদিন ভোরের আগে বিছানা থেকে উঠে পড়লেন। ঘড়ির কাঁটায় তখন ঠিকঠিক চারটে। আবছা আঁধার লেগে আছে ঘরবাড়ির গায়ে। পার্কে কুয়াসা জড়িয়ে রয়েছে। রাস্তায় কদাচিৎ চাপা গরগর শব্দে চলে যাচ্ছে একটা করে মোটরগাড়ি—তখনও হেডলাইট জ্বলছে। হরিপদবাবু পার্কে ঢুকে হন্তদন্ত এগিয়ে গেলেন দক্ষিণ-পূর্ব কোণে। বকুলতলা ঝুপসি হয়ে আছে আঁধারে-কুয়াসায়। ঘাসে শিশির চকচক করছে। পাথরটা খালি পড়ে আছে। হরিপদবাবু

সিংহাসন দখল করার আনন্দে বসে পড়লেন তার ওপর। পাথরটা ঠাণ্ডা বটে, তাতে কিছু আসে-যায় না। হরিপদবাবু খুশিতে বসে দুই পা দোলাতে থাকলেন। এমন-কী গুনগুন করে গানও গাইতে লাগলেন।

আস্তে আস্তে কালচে রঙ ধূসর হতে থাকল। তারপর সাদা হল। একজন-দুজন করে লোক এসে পার্কে ভিড় করল। কেউ ধুকুর-ধুকুর দৌড়ুচ্ছে। কেউ যোগব্যায়ামেও বসে গেছে। কেউ কুকুর নিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। বেঞ্চগুলোতে বুড়োরাও এসে বসে পড়েছে। তারপর ছেলেপুলের পাঁয়তারা শুরু হয়েছে ফুটবল নিয়ে। হরিপদবাবু তেমনি নিরিবিলি বকুলতলায় গুনগুন করছেন আর ঠ্যাঙ দোলাচ্ছেন।

কতক্ষণ পরে আনমনে মাথায় একবার হাত বুলোতে গিয়েই চমকে উঠলেন। এ কী! তাঁর মাথাভর্তি একরাশ পাকা চুল ছিল। চুল কোথায় গেল?

বারবার হাত ঘষেও চুলের পাত্তা পেলেন না। চামড়ায় হাত ঠেকছে। তার মানে, হঠাৎ তাঁর মাথায় টাক পড়ে গেল নাকি? অবাক হয়ে মাথায় আঙুল ঠুকলেন। আরও চমকে গেলেন। সর্বনাশ! তাঁর মাথাভর্তি টাক যে!

তারপর হাত গালে ঘষে ঘাবড়ে গেলেন। প্রতিদিন দাড়ি কাটা অভ্যাস। পার্ক থেকে ফিরেই দাড়ি কাটেন। কালও কেটেছেন। চব্বিশ ঘণ্টায় এত দাড়িগোঁফের জঙ্গল গজানো অসম্ভব। অথচ গজিয়েছে।

প্রচণ্ড আঁতকে উঠে হরিপদবাবু টের

নির্মল শ্বাস-প্রশ্বাস...
সুস্থ সবল দাঁত

কোলগেট
ডেন্টাল ক্রীমের গুণে

প্রতিবার খাওয়ার পরেই কোলগেট দিয়ে দাঁত মাজুন। আপনার দাঁতকে সুরক্ষিত রাখার জন্যে সারা পৃথিবীতে দাঁতের ডাক্তাররা এই উপদেশই দেন।

দাঁতের ফাঁকে খাবারের টুকরো থেকে গেলে রোগ-জীবাণুর সৃষ্টি হয়। ফলে নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ আসে, পরে দাঁতে যন্ত্রনাদায়ক ক্ষয়রোগের শুরু হয়ে যায়।

সুতরাং প্রতিবার খাওয়ার পরেই কোলগেট দিয়ে দাঁত মাজুন। দাঁতকে সাদা ঝকঝকে করে তুলে নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ ও দাঁতের ক্ষয় রোধে কোলগেটের অসাধারণ ক্ষমতা বহুবার প্রমাণিত হয়ে গেছে।

কোলগেটে এমন এক চমৎকার তাজা মিন্টি স্বাদ রয়েছে যে অনেকক্ষণ ধরে দাঁত ব্রাশ করতে ইচ্ছা করবেই।

কোলগেটের নির্ভরযোগ্য ফরমূলা কি ভাবে কাজ করে!

নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ ও দাঁতের ক্ষয়রোগের জীবাণু জন্ম নেয় দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা খাবারের টুকরো থেকে।

কোলগেটের প্রচুর ফেনা দাঁতের ফাঁকে ঢুকে অবাঞ্ছিত খাবারের টুকরো ও রোগ জীবাণু দু'ইই দূর করে।

ফলাফলঃ সাদা ঝকঝকে দাঁত, নির্মল তাজা শ্বাস-প্রশ্বাস ও দন্তক্ষয় রোগ প্রতিরোধের দৃঢ় মনোবল।

কোলগেট ডেন্টাল ক্রীম দিয়ে
নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ দূর করুন...
দাঁতের ক্ষয় রোধ করুন!

DC.G.74 BN

পেলেন, তাঁর গায়ের ঢিলেঢালা পানজাবি আঁটো হয়ে গেছে। চটিজুতোয় পা দুটো আর ঢুকছে না। এ তো ভারী সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার! আঙুল ফুলে কলাগাছ ব্যাপার কি একেই বলে?

হতবুদ্ধি হয়ে বসে আছেন হরিপদবাবু। এমন সময় লাঠি ঠুকঠুক করে এক ভদ্রলোক পাশ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ থেমে মুচকি হেসে বললেন, "ভোম্বলবাবু যে! আছেন কেমন? বহুদিন তো দেখাশোনাও নেই। বাইরে কোথাও গিয়েছিলেন বুঝি?"

হরিপদবাবু খাপ্পা হয়ে বললেন, "ভোম্বলবাবুকে মশাই? আমি হরিপদ তালুকদার।"

ভদ্রলোক খিকখিক করে হাসলেন। "চিরকাল থিয়েটারে অ্যাকটিং করে অভ্যাসটা এখনও ছাড়েননি দেখছি ভোম্বলবাবু! তা ইয়ে, আপনার জামাইবাবাজির খবর কী? শুনেছিলুম, পুলিশ নাকি . . . "

হরিপদ তেড়ে উঠে বললেন, "কী যাতা বলছেন মশাই? আমার মেয়েই নেই তো জামাই।"

"আহা, ওতে লজ্জার কী আছে ভোম্বলবাবু?" ভদ্রলোক বললেন। "পুলিশ কাউকে ধরলেই তো সে চোর হয়ে যায় না। আদালত আছে কী করতে?"

হরিপদবাবু আর বরদাস্ত করতে পারলেন না। তাঁর জামাই নেই। যদি দৈবাৎ থাকতও, তাকে চুরির দায়ে পুলিশ ধরত—ভাবতেও মাথায় খুন চড়ে যায়। কথা না বাড়িয়ে তক্ষুনি হন্তদন্ত কেটে পড়লেন। ভদ্রলোক অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন।

পার্ক থেকে বেরুবার মুখে আরেক ভদ্রলোক তাঁকে দেখে বলে উঠলেন, "আরে! ভোম্বলদা যে!"

হরিপদবাবু কটমট করে তাকিয়ে জোরে হাঁটতে থাকলেন। পেছনে ভদ্রলোক তখন বলছেন, "হল কী ভোম্বলদা? আরে, শোনো শোনো!"

কোনোদিকে না তাকিয়ে হরিপদবাবু গলিরাস্তায় পৌঁছলেন। তারপর নিজের বাড়ির দরজায় কলিং বেলের বোতাম টিপলেন। ততক্ষণে আরও টের পেয়েছেন, তাঁর গায়ে প্রচণ্ড জোরও এসে গেছে। কিন্তু বুকটা ঢিপ-ঢিপ করে কাঁপছে। একটা দারুণ গণ্ডগোল নিশ্চয় ঘটে গেছে।

দরজা খুলে তাঁর প্রিয় চাকর-কাম-রাঁধুনি হরু গম্ভীরমুখে বলল, "কাকে চাই?"

হরিপদবাবু গর্জে উঠলেন এবার। "কাকে চাই কী রে ব্যাটাচ্ছেলে? ভাঙ খেয়েছ সাতসকালে?" তারপর হরুকে ঠেলে ঘরে ঢুকে গেলেন।

হরু হৈ-চৈ করে উঠল। "আচ্ছা ভদ্রলোক তো মশাই আপনি! গায়ের জোরে পরের বাড়ি ঢুকে পড়লেন যে বড়? আরে! ও কী! কোথায় যাচ্ছেন?"

হরিপদ সটান নিজের শোবার ঘরে ঢুকে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড আঁতকে দেখলেন, রোজ পার্কের বকুলতলায় পাথরটার ওপর যে লোকটাকে বসে থাকতে দেখেছেন, সেই লোকটাই বটে। হরিপদবাবু তার শরীরটা নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন! কিন্তু তাঁর নিজের শরীরটা কোথায় গেল, সেটাই সমস্যা। আর ছ্যা-ছ্যা, এমন বিচ্ছিরি নাক থাকতে আছে মানুষের?

হরু ততক্ষণে পাড়া মাথায় করে চেঁচাচ্ছে, "ডাকাত! ডাকাত পড়েছে!" এমন জোর করে শোবার ঘরে ঢোকে যে, সে নিশ্চয় ডাকাত। হরিপদবাবু আয়নার সামনে হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ভেবে কোনো কূলকিনারা পাচ্ছেন না। পার্কে বেড়াতে গেলেন হরিপদবাবু হয়ে, ফিরে এলেন কোন হতচ্ছাড়া ভোম্বলবাবুটি হয়ে—যিনি নাকি একসময় থিয়েটারে অ্যাকটিং করতেন এবং যাঁর জামাই লোকটা চোর না হয়ে যায় না! এ কী সর্বনেশে কাণ্ড রে বাবা!

কিন্তু তার চেয়ে সর্বনেশে কাণ্ড যে ঘটতে চলেছে, ঠাহর হল পাড়ার লোকের হট্টগোলে। বাড়ির দরজায় ওরা চেঁচাচ্ছে, "কই ডাকাত! কোথায় ডাকাত! ধর ব্যাটাকে! মার মার!" কেউ বলছে, "যাস্‌নে, যাস্‌নে! ভোজালি আছে। পিস্তল আছে। পুলিশ ডাক!" তার মধ্যে হরু এনতার চেঁচাচ্ছে, "সব লুঠ হয়ে গেল যে! ওরে বাবা! এতক্ষণ সব লুঠ করে ফেললে রে!"

সাহসী ছেলেরা লাঠিসোটা নিয়ে বাড়ি ঢুকেছে টের পেয়েই হরিপদবাবুর বুদ্ধি খুলে গেল। দড়াম করে দরজায় খিল এঁটে দিলেন। দরজার বাইরে ছেলেগুলো হল্লা করছে। কেউ লাথি দিচ্ছে দরজায়। হরিপদবাবু ভেতর থেকে

শাসিয়ে বললেন, "সাবধান! আমার কাছে বোমা আছে। উড়িয়ে দেব!"

ছেলেগুলো ভয় পেয়ে গেল। বয়স্করা বললেন, "ওরে! সরে আয়! সরে আয়! পুলিশে খবর গেছে।"

পুলিশের কথা শুনে হরিপদবাবুর বুকের কাঁপুনি বেড়ে গেল। তখন ঘরের ভেতর থেকে করুণ স্বরে ডাকলেন, "হবু! ওরে বাবা হারাধন! আমি তোর মনিব হরিপদ চাকলাদার। সত্যি বলছি!"

হবু বলল, "চালাকি হচ্ছে? আমার মনিব আমি চিনিনে? ওইরকম চেহারা নাকি ওনার? ওইরকম হেঁড়ে গলা নাকি! ওইরকম থ্যাবড়া নাক? ছ্যা-ছ্যা, যেন নিমতলার আস্ত পিচেশ!"

গণ্ডগোল একটু থেমেছে। সবাই পুলিশের প্রতীক্ষা করছে। হরিপদবাবুর গলা আবার শোনা গেল ঘরের ভেতর থেকে, "সত্যি বলছি, আমি হরিপদ তালুকদার। দোহাই তোমাদের, এখন পুলিশ-টুলিশ ডেকো না! ও বাবা হারাধন! ওদের বুঝিয়ে বল্ না একটু। আমিই তোর কর্তাবাবু রে।"

হবু তেড়েমেড়ে বলল, "বলবটা কী মশাই! হরিপদবাবুর বাড়ি সেই এতটুকুন বাচ্চা বয়েস থেকে কাজ করছি। আমি কর্তাবাবুকে চিনিনে! থামুন, দারোগাবাবুকে আসতে দিন!"

বলতে বলতে এসে গেলেন দারোগাবাবু। পেল্লায় গোঁফের ডগায় পাক খাইয়ে বললেন, "কই? কোথায় ডাকাত!"

সবাই একগলায় বলে উঠল, "ওই ঘরের ভেতর স্যার!"

দারোগাবাবু হাঁক মেরে বললেন, "গিরধর সিং! দরওয়াজা তোড়ো! জলদি তোড়ো!"

শুনেই হরিপদবাবু হামাগুড়ি দিয়ে খাটের তলায় ঢুকতে যাচ্ছেন, টাকে খাটের একটা ধার জোরে লাগল। উঃ করে ককিয়ে উঠলেন।

তারপর দেখলেন, প্রচণ্ড অবাক হয়েই দেখলেন, পড়ে গেছেন শিশিরভেজা ঘাসে এবং বকুলতলার সেই পাথরটাতে ঠোক্কর লেগেছে মাথায়। বেশ জোরেই লেগেছে।

এই সময় কেউ বলে উঠল, "আহা! লাগল নাকি!"

তাকিয়ে দেখে অবাক হরিপদ তালুকদার। সেই টাকওয়ালা লোকটা, মুখে দাড়িগোঁফের জঙ্গল—রোজ যে এই পাথরের আসনটা দখল করে বসে থাকে এবং যে কিছুক্ষণ আগে তাঁকে সর্বনাশের মুখে ফেলে দিয়েছিল।

লোকটা হাসতে হাসতে বলল, "ওখানে বসলেই কিন্তু ঘুম পায়। বুঝলেন!"

হরিপদবাবু মনে মনে বললেন, বুঝেছি। তার মানে পাথরটা দখল করার জন্য রাত চারটেয় শেষ ঘুম বরবাদ করার শাস্তিটা ভালই পেয়েছেন। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "মশায়ের নাম কি ভোম্বলবাবু?"

"আজ্ঞে না। আমার নাম হরিপদ চাকলাদার।"

শুনেই হরিপদবাবু হন-হন করে কেটে পড়লেন। আর কক্ষনো এ ভুতুড়ে পার্কে আর এত ভোরে বেড়াতে আসবেন না। বাড়ির কাছাকাছি হতে হঠাৎ মনে হল, নামটা কি হরিপদ চাকলাদার বলল, না তালুকদার বলল? চাকলাদার না তালুকদার? তালুকদার না চাকলাদার?

তালুকদার হলে বেটাচ্ছেলে আমার মতোই বিপদে পড়তে পারে। এই ভেবে হরিপদ শেষে খিকখিক করে আপন মনে হেসে উঠলেন।

ছবি সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

বিখ্যাত ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী স্যার উইনস্টন চার্চিল ছিলেন একজন খুব ভাল বক্তা। একবার তাঁর এক অনুরাগী তাঁকে জিজ্ঞাসা করে, "আচ্ছা, আপনি যখন দেখেন আপনার বক্তৃতা শোনার জন্যে সভাকক্ষ দর্শকে পূর্ণ হয়ে কানায়-কানায় ভরে গেছে, আপনার কি খুব আনন্দ হয় না?" চার্চিল হেসে বললেন, "সত্যি, ব্যাপারটা খুবই গৌরবের। কিন্তু আমি যখনই ভাবি যে, ওখানে আমার বক্তৃতা না হয়ে আমাকে যদি ফাঁসিতে লটকানো হত, তা হলে দর্শকসংখ্যা এর চেয়েও তিনগুণ হত, তখন আর তত আনন্দ হয় না।"

শিশিরকুমার বসু

(৩৪)

কিছু তথ্য আছে যার থেকে মনে হয় যে, ১৯৪০-এর প্রথম দিকে রাঙাকাকাবাবু দেশ ত্যাগ করার উপায় ও সম্ভাবনা সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিচ্ছিলেন। উত্তর-পশ্চিম ভারতে সেই সময় কীর্তি-কিষান পার্টি বলে একটি দল ছিল। সেই দল সম্ভবত সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে একটা যোগাযোগ গড়ে তুলতে চাইছিল। তা ছাড়া, ঐ অঞ্চলে রাঙাকাকাবাবুর নিজের দলের বিশ্বস্ত অনুগামীও বেশ কয়েকজন ছিলেন। এঁদের মধ্যে বেছে-বেছে কয়েকজনকে রাঙাকাকাবাবু তাঁর গোপন বিদেশ-যাত্রার আয়োজনে কাজে লাগাতে চেষ্টা করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত ফল দেখে ঝোঝাই যায় যে, ঐ প্রাথমিক চেষ্টা বিশেষ কার্যকরী হয়নি। সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে যে কোনো ব্যবস্থাই করা যায়নি সেটা পরের অভিজ্ঞতা থেকে পরিষ্কার হয়ে যায়।

ব্যাপারটার আর একটা দিকও আছে। মার্চ মাসে আপস-বিরোধী সম্মেলনের পর থেকেই রাঙাকাকাবাবুর অনুগামী ও সহকর্মীদের ব্যাপক ধরপাকড় আরম্ভ হয়ে যায়। তার ওপর আবার তিনি হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের জন্য আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন। ৩ জুলাই তিনি প্রথম সত্যাগ্রহী হবেন বলে ঘোষণাও করলেন। ঐ ঘোষণার পর সরকার আর চুপ করে থাকল না, সেই দিন সকালেই তাঁকে গ্রেফতার করল।

এখন কথা হল, রাঙাকাকাবাবু যখন অন্তর্হিত হওয়ার কথা ভাবছেন তখন তিনি কেন হলওয়েল মনুমেন্ট সত্যাগ্রহের ডাক দিয়ে গ্রেফতারের ঝুঁকি নিলেন? এর দুরকম ব্যাখ্যা হতে পারে। প্রথমত, এটা ছিল হয়তো সরকার পক্ষকে ধোঁকা দেওয়ার একটা উপায়। যাতে তারা মনে করে যে, তিনি যখন অন্য ধরনের প্রশ্ন নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছেন, তাঁর অন্য কোনো বৈপ্লবিক কর্মসূচী নেই। দ্বিতীয়ত, রাঙাকাকাবাবু হয়তো ভাবছিলেন যে, সরকার শেষ পর্যন্ত তাকে গ্রেফতার করবে না। এরকম চিন্তা করার যুক্তিও ছিল। যুদ্ধ আরম্ভ হবার কিছুদিনের মধ্যেই বাংলার গভর্নমেন্ট সভাসমিতি, মিছিল ইত্যাদির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। রাঙাকাকাবাবু তা অমান্য করে নানা জায়গায় সভা করেন ও যুদ্ধবিরোধী প্রচার করেন। সরকার কিন্তু এটা চুপচাপ হজম করে নেয়। তারপর মে ও জুন মাসে ঢাকায় ও নাগপুরে বড়-বড় সম্মেলন করে রাঙাকাকাবাবু খোলাখুলি ভাবে দেশবাসীকে সংগ্রামের পথে আহ্বান করেন। এ-সব দেখে-শুনেও সরকার তাঁকে গ্রেফতার করতে এগোয়নি। তা ছাড়া হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের আন্দোলন এমন একটা ব্যাপার, যাতে মুসলমান সম্প্রদায়ের বেশ সহানুভূতি ছিল। ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ দলের কেউ-কেউ তাঁর প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন।

রাঙাকাকাবাবু যাই ভেবে থাকুন না, তিনি বন্দী হলেন। যুদ্ধের মধ্যে যখন সারা জগতে ভাঙাগড়া চলছে তখন জেলের মধ্যে হাত গুটিয়ে বসে থাকা তাঁর মোটেই পছন্দ ছিল না। তাঁর স্থির বিশ্বাস হয়েছিল যে, অদৃষ্টের বিধানে পৃথিবীর ঐ সংকটকালে দেশের মুক্তির জন্য তাঁকে দুঃসাহসিক কিছু করতে হবে। শত্রুপক্ষ তো একদিকে তাঁকে ভারতরক্ষা আইনে বিনা বিচারে বন্দী করল, অন্যদিকে একটি জনসভায় রাজদ্রোহাত্মক বক্তৃতার দেওয়ার জন্য ও 'ফরওয়ার্ড ব্লক' পত্রিকায় একটি আপত্তিকর প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য দুটি মামলাও রুজু করল।

মামলার শুনানি আলিপুর কোর্টে হত। প্রেসিডেন্সি জেল থেকে কড়া পুলিশ-পাহারায় রাঙাকাকাবাবুকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হত। আমরা দল বেঁধে মামলা শুনতে যেতাম। রাঙাকাকাবাবুর পক্ষের উকিল পালাশের

ক্লোজ-আপ তাজা নিঃশ্বাস, আর ক্লোজ-আপ সাদা দাঁতের জন্যে

স্বচ্ছ লাল

ক্লোজ-আপ

একাধারে টুথপেস্ট আর মাউথওয়াশ

আপনি যখন সত্যিসত্যিই লোকের খুব কাছে থাকেন, আপনার চাই ক্লোজ-আপ—এক সম্পূর্ণ নতুন ধরণের টুথপেস্ট। এর আসল মাউথওয়াশ দিয়ে আপনার নিঃশ্বাস হয় ক্লোজ-আপ-তাজা, আর দুটি বিশেষ উপাদান দিয়ে আপনার দাঁত হয় ক্লোজ-আপ-সাদা!

কাছে, আরো কাছে পেতে—

ক্লোজ-আপ

হিন্দুস্থান লিভার-এর উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিনটাস-CX. 35-1812 BG

মুক্তির পরে সুভাষচন্দ্র, ডিসেম্বর ১৯৪০

রিপোর্টারদের জেরা করে বেশ নাস্তানাবুদ করতেন। আমাদের বেশ মজা লাগত। একবার বেশ জোরের সঙ্গে এবং যুক্তির ভিত্তিতে রাঙাকাকাবাবুর পক্ষ থেকে জামিনের আবেদন করা হল। ম্যাজিস্ট্রেট তো আইনমতো জামিন মঞ্জুর করলেন, কিন্তু তারপরেই বললেন,তিনি জামিন দিচ্ছেন কিন্তু সেটা কার্যকরী হবে কি না তা নিয়ে তাঁর যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ, অন্য এক আইনের বলে সরকার রাঙাকাকাবাবুকে বিনা-বিচারে ধরে রেখেছে। এই দু-মুখো সরকারি নীতির বিরুদ্ধে রাঙাকাকাবাবু লড়াই আরম্ভ করলেন। কেন্দ্রীয় বিধানসভার নির্বাচিত সদস্য হিসেবেও তিনি মুক্তি দাবি করলেন, কিন্তু কোনো ফল হল না। বোঝা গেল, রাঙাকাকাবাবুর প্রতি গভর্নমেণ্টের মনোভাব বেশ কঠোর।

বাবার শরীর সে-সময় ভাল যাচ্ছিল না। রাঙাকাকাবাবু জেলে গেলেই অসুস্থ হতেন কিন্তু বেরিয়ে এসে কিছুদিনের মধ্যে আবার বেশ সবল হয়ে উঠতেন। ১৯৩২ থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত জেলে থাকার সময় বাবার শরীর বেশ ভেঙে যায়। কিন্তু পরে অনেক চেষ্টা করেও বাবা আগের স্বাস্থ্য ফিরে পাননি, যদিও কাজকর্ম তিনি পুরোদমে শেষ পর্যন্ত চালিয়ে গেছেন। অল্প বয়স থেকে তাঁর ডায়াবেটিস রোগ থাকায় এবং জেলে অসুখটা বেড়ে যাওয়ায় তিনি হয়তো কখনোই পুরোপুরি সেরে উঠতে পারেননি। ছুটির সময় বাবা প্রায়ই স্বাস্থ্যকর কোনো জায়গায় কিছুদিন কাটিয়ে আসতেন। অবশ্য কাজ তাঁর পেছন-পেছন দৌড়ত। পুরোপুরি অবসর তিনি কখনোই পেতেন না। ১৯৪০-এর পুজোর ছুটিতে

বাবা-মা দেরাদুন যাওয়া স্থির করলেন। তার আগে বাবা মাঝে-মাঝে রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে যেতেন। মা'র কাছে শুনেছি,সেই সময় রাঙাকাকাবাবু বাবাকে বার-বার বলতেন, যখন উত্তর ভারতে যাবেন তিনি যেন সীমান্ত প্রদেশের মিঞা আকবর শাহকে ডেকে পাঠান এবং রাশিয়ায় যেতে বলেন। আকবর শাহ ছিলেন রাঙাকাকাবাবুর বিশ্বস্ত অনুগামী, সীমান্ত প্রদেশের ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা। এর থেকে বোঝা যায় যে, রাঙাকাকাবাবুর ইচ্ছা ছিল নিজের কোনো বিশ্বস্ত রাজনৈতিক সহকারীর মাধ্যমে বিদেশের রাষ্ট্রনায়কদের সঙ্গে কথাবার্তা আরম্ভ করা। নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী প্রেসিডেন্সি জেলে রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গী ছিলেন। রাঙাকাকাবাবুর আগেই নরেনবাবুর মুক্তি পাওয়ার একটা সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। নরেনবাবুকে রাঙাকাকাবাবু বলেছিলেন, মুক্তির পর গোপনে বিদেশে (রাশিয়া ও ইউরোপে) চলে যাওয়ার চেষ্টা করতে। ইউরোপের কয়েকজন রাষ্ট্রনায়কের নামে তিনি চিঠি দেবেন বলেছিলেন এবং সেগুলি কীভাবে লুকিয়ে জেলের বাইরে নিয়ে যাওয়া হবে, তাও শিখিয়ে দিয়েছিলেন। এই সূত্রে নরেনবাবু আমাকে বলেছিলেন যে, তাঁর বিদেশে যাওয়ার বিষয়ে আলোচনার সময় রাঙাকাকাবাবু আমার সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করেছিলেন।

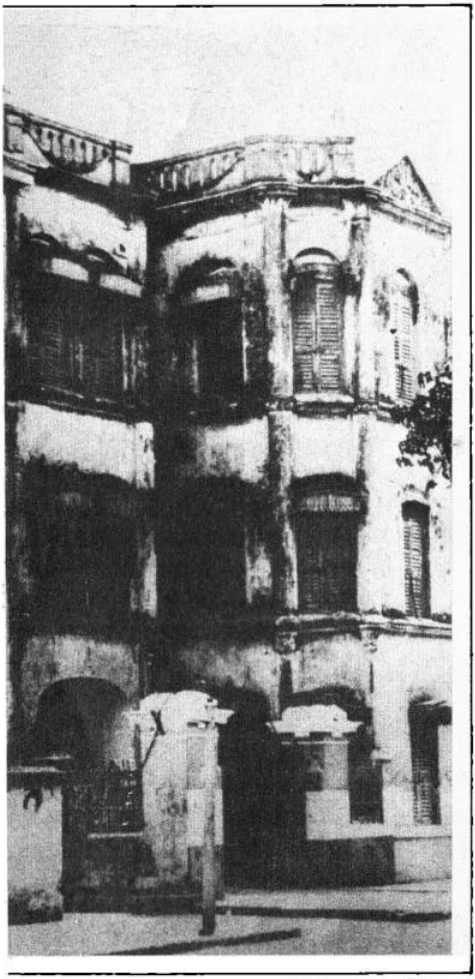

আজকের নেতাজি-ভবন

ঠিক কবে রাঙাকাকাবাবু স্থির সিদ্ধান্ত নিলেন যে তিনি নিজেই বিদেশে পাড়ি দেবেন সেটা বলা শক্ত। এই কঠিন সিদ্ধান্তের দিকে যে তিনি কয়েক মাস ধরে এগোচ্ছিলেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এটা ধরেই নেওয়া যায় যে, যেদিন তিনি মুক্তির দাবিতে আমরণ অনশনের সঙ্কল্প নিয়েছিলেন, সেদিন তিনি চূড়ান্তভাবে মনস্থির করে ফেলেছিলেন। এত বড় ঝুঁকিআমাদের দেশের সাম্প্রতিক ইতিহাসে কেউ নিয়েছেন বলে আমার জানা নেই। দেরাদুন থেকে ফেরার পর বাবা আবার রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে জেলে দেখা করতে আরম্ভ করলেন। একদিন তো বাবা খুবই চিন্তিত হয়ে বাড়ি ফিরলেন। সরকারপক্ষের বন্ধুভাবাপন্ন ব্যক্তিরা বার-বার বলছেন, সুভাষবাবুকে এই মারাত্মক পথ থেকে নিবৃত্ত করুন। কারণ, গভর্নমেণ্টর মনোভাব খুবই কঠোর এবং তারা কিছুতেই তাঁকে মুক্তি দেবে না। এদিকে বাবা জানেন যে, রাঙাকাকাবাবুর আমরণ অনশন মানে আমরণ অনশন। তাঁর দাবি স্বীকৃত না হলে কেউ তাঁকে ফেরাতে পারবে না। যাই হোক, রাঙাকাকাবাবু কালী পুজোর দিন অনশন আরম্ভ করলেন। বাড়ির সকলেরই মনের যা অবস্থা—সেটা লিখে বোঝানো শক্ত।

দিন-সাতেক অনশন চলার পর হঠাৎ এক বিকেলে খবর এল যে, সরকার রাঙাকাকাবাবুকে বিনা শর্তে মুক্তি দিয়েছে। এ-ব্যাপারে ভারত ও বাংলার সরকারের মধ্যে যে-সব চিঠিপত্র

বিনিময় হয়েছিল, সেগুলি আমি সম্প্রতি দেখেছি। সেই সময়েই কিন্তু বাবা,রাঙাকাকাবাবু ও বসুবাড়ির এক অকৃত্রিম বন্ধু ভেতরের খবর রাঙাকাকাবাবুকে জানাতেন। তিনি হলেন তখনকার অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের নৃপেন ঘোষ। নৃপেনবাবু সরকার-ঘেঁষা সংবাদ-সংস্থায় কাজ করতেন, কিন্তু কোনো গোপন খবর তাঁর গোচরে এলে তিনি বাবা বা রাঙাকাকাবাবুকে গোপনে জানিয়ে যেতেন। বাংলার গভর্নর ও মন্ত্রিসভা হঠাৎ বেশ ভয় পেয়ে গেল। জেলের সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্‌ট সাহেবের রিপোর্ট বেশ খারাপ ছিল, এবং তাতে ইঙ্গিতও ছিল যে, অনশন চলার সময় জেলে বন্দীর মৃত্যু মোটেই অসম্ভব নয়। এদিকে ভারত সরকার কোনোমতেই তাঁকে মুক্তি দিতে রাজি নয়। বাংলার সরকার তাঁকে কিছুদিনের জন্য মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় ভারত সরকার ঘোরতর আপত্তি জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন। উত্তরে কলকাতা থেকে ইংরেজ গভর্নর লিখেছিলেন, কোনো চিন্তা কোরো না। আমরা সুভাষ বসুর সঙ্গে, বিড়াল যেমন ইঁদুরের সঙ্গে খেলে, তাই করছি।

জেলের সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্‌ট রাঙাকাকাবাবুর প্রতি খুব শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনি বারবার রাঙাকাকাবাবুর কাছে এসে অনশন ভঙ্গ করার অনুরোধ জানাতেন। বলতেন, আপনি বুঝছেন না কেন 'ইভ্‌ন এ লাইভ ডংকি ইজ বেটার দ্যান এ ডেড লায়ন'! সুপারিনটেনডেনটের হাতে ফলের রস খেয়েই রাঙাকাকাবাবু অনশন ভঙ্গ করেন।

রাঙাকাকাবাবুকে ছেড়ে দিয়েছে শুনেই আমরা এলগিন রোডের বাড়িতে ছুটলাম। শুনলাম অ্যাম্বুলেন্সে করে তাঁকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। আমি গিয়ে দেখলাম নিজের ঘরে তিনি শুয়ে রয়েছেন। বেশ ফ্যাকাশে ও দুর্বল দেখাচ্ছিল তাঁকে, কিন্তু চোখ আগের মতোই উজ্জ্বল। ওঁর গোঁফ জেলে থাকতেই দেখেছিলাম, দেখলাম সেই গোঁফ আরও ঘন হয়েছে। খোঁচা-খোঁচা দাড়িও গজিয়েছে।

অভ্যাসমতো আমি দরজার সামনে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলাম। ইঙ্গিতে কাছে ডাকলেন। কাছে যেতেই কোনো কথা না বলে আমার হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে চুপ করে রইলেন অনেকক্ষণ। (ক্রমশ)

ছবির মজা

তিন জলকন্যার ছবি কি ঠিক একই রকম?

(না, তিন-নম্বর জলকন্যার মাথায় ফুলের সংখ্যা কম।)

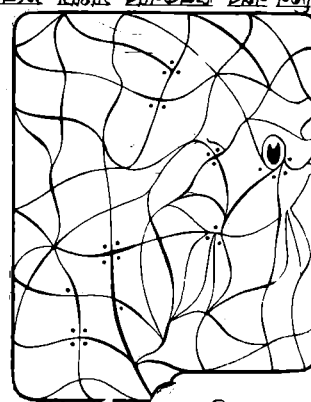

ফুটকি-দেওয়া অংশগুলিকে রং-পেনসিল বুলিয়ে রঙিন করলেই চমৎকার একটা মাছের ছবি পেয়ে যাবে।

এবার নিন! প্রাণচঞ্চল জীবনের জন্য অফুরান শক্তির রসদ

বুস্ট

মল্ট চকোলেট মিল্ক ড্রিঙ্ক

একটি ট্রেনের ইঞ্জিনের যেমন, আপনারও তাই—দিনটাকে ঠিকমতো শুরু করতে দরকার অফুরন্ত শক্তি। তাই রোজ সকালে আপনার চাই বুস্ট।

এই শক্তির রসদ আপনাকে সারাদিন তরতাজা, আর চূড়ান্ত গতিমান করে রাখে, বিশেষ করে ছেলেমেয়েদের, দৌড়ঝাঁপে যাদের শক্তি ক্ষয় হয় সবচেয়ে বেশী।

ওদের বুস্ট খেতে দিন। বুস্ট, মল্ট, কোকো আর দুধ থেকে তৈরী। পুষ্টির ব্যাপারে যারা সবথেকে ভাল বোঝেন সেই বিখ্যাত হরলিক্স নির্মাতাদেরই তৈরী-বুস্ট!

ঘন সুস্বাদু বুস্ট বেশী শক্তি যোগাতে অতুলনীয়, কারণ তা তৈরী হয় পুষ্টিকর ক্রীমযুক্ত দুধ, গম, মল্ট বার্লি আর কোকো থেকে।

আপনার ছেলেমেয়েকে সুস্থ-সবল করে গড়ে তুলতে বুস্টে রয়েছে অধিক সংখ্যক পুষ্টিকর উপাদান।

আর তা'ছাড়া বুস্টের স্বাদ! সারা পরিবারের জিভে-জল-আসা ঘন মল্ট চকোলেটের মজা! বুস্ট।

দিন শুরু করার শ্রেষ্ঠ উপায়। প্রতিদিন।

Boost 'হরলিক্স' নির্মাতাদের তৈরী

৫০০ গ্রাম-এর সাশ্রয়কারী রিফিল প্যাকেও পাওয়া যায়। এইটি কিনে ১ টাকা বাঁচান।

HTD-HMM-6820

আগের কথা: শিশিরের অসুখটা অদ্ভুত। চোখের সামনে নানা আজগুবি ব্যাপার ঘটে। অচেনা লোক বলে, কাছে যা আছে, তা না-রাখাই ভাল। সেটা কি এই পুরনো আঙটি? বাবুদা তাকে কৃষ্ণদয়ালের কাছে নিয়ে যায়। তিনি নানা অভিশপ্ত বস্তুর কথা শোনান। ভুয়ো টেলিগ্রাম পেয়ে শিশির হাজারিবাগে আসে। রহস্যময় মানুষ সিংহিবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়। পথে আক্রান্ত হয়ে শিশির থানায় গিয়েছিল। কিন্তু সিংহিবাবু বলেন, তিনি শত্রু নন। আগে যে শিশিরদের বাড়িতে কাজ করত, সে কি ওষুধ মেশাত শিশিরের খাবারে? ইতিমধ্যে ভবতোষ নামে এক ভদ্রলোকের বাড়িতে বিস্তর টেলিগ্রাম-ফর্মের খোঁজ মিলেছে। সিংহিবাবু ভরতোষের বাড়িতে যান কেন? তারপর...

॥ ২১ ॥

শিশিরকে দেখাতে হল না, বাবু দূর থেকেই বুঝতে পারল, বিরাট ওই বাড়িটা ভবতোষ সান্যালের। বোঝা অবশ্য কঠিন ছিল না। চারদিক ফাঁকা, মাঠ আর মাঠ, শুধুমাত্র একটিই বাড়ি; বাড়ির একেবারে গায়ে গায়ে কোনো লোকালয় নেই, সামান্য তফাতে দু-চার ঘর দেহাতির বাস।

বাবু প্রথমে কিছু বলেনি। খানিকটা এগিয়ে এসে বলল, "বাড়িটা কিন্তু তত বড় নয়, চৌহদ্দিটাই বিরাট।"

শিশিরেরও মনে হল, উঁচু পাঁচিল, গাছগাছালির জন্যে বাড়িটাকে যেন আরও বড় মনে হয়। আসলে বাংলো ধরনের বাড়ি, যতখানি ইমারত তার অন্তত চার গুণ ফাঁকা জমি। আর বাগান।

শিশির বলল, "বাবুদা, এই জায়গায় লোকে এত বড় বাড়ি করে?"

বাবু বলল, "টাকা-পয়সা থাকলেই করে। শখ। এ-রকম শখ বনেদি বাঙালি বাবুদের খুবই ছিল আগে। আজকাল আর নেই।"

"না থাকাই ভাল। পয়সা নষ্ট।" শিশির বলল।

রেল-লাইনের গা বেয়ে সরু হাঁটা পথ। সেই পথ ধরে শিশিররা এসেছিল। সোজা পথ তারা ইচ্ছে করেই এড়িয়েছে। কিছু বলা যায় না। কে কোথায় নজর রাখছে কে বলবে!

আরও খানিকটা এগিয়ে এল শিশিররা। এই জায়গা থেকে বাড়িটাকে মোটামুটি দেখা যায়। তারা রেল-লাইনের পাশে দাঁড়িয়ে, জায়গাটা উঁচু। আশপাশের মাঠঘাট বেশ খানিকটা নিচু জমিতে। বাড়িটাও। রেল-লাইন থেকে অন্তত শ'-খানেক গজ দূরে বাড়ি। চার দিকে উঁচু পাঁচিল। বাড়ির সামনের দিকে বড়সড় গাছপালা না থাকলেও পেছন দিকে যে আছে সেটা বোঝা যাচ্ছিল। কোথাও কোনো লোকজন চোখে পড়ছিল না। কুকুরের ডাক দু-চার বার শোনা গেল।

বাবু বলল, "বিস্তর পয়সাঅলা লোকের বাড়ি, বুঝলি?"

"সে তো বোঝাই যায়," শিশির বলল।

বাবু বলল, "তা নয়। একটা জিনিস লক্ষ করলে টাকার বহরটা বুঝতে পারবি।"

"কী জিনিস?"

"গেটের কাছে একটা ওয়াচ টাওয়ার রয়েছে, তার মাথায় সার্চলাইট দেখেছিস?"

শিশির দেখেছিল, কিন্তু খেয়াল করেনি। বলল, "হ্যাঁ, ওই উঁচু পোস্টটা তো!"

"আর একটা জিনিস দ্যাখ। অত উঁচু পাঁচিল। তবু পাঁচিলের ওপর আরও হাত-দুই উঁচু করে তার-কাঁটা লাগানো। সান্যালমশাই সব দিক এত সামলে রেখেছেন কেন? চোর-ডাকাতের ভয়ে?"

"তা ছাড়া আর কেন হবে?"

"এদিকে আবার কুকুরও আছে। বোধ হয় বন্দুকও রাখেন।"

শিশিরেরও মনে হল, সান্যালমশাই প্রয়োজনের বেশি সতর্ক, সাবধানী। এত সাবধান হবার কী আছে? কোনো গুপ্তধন লুকিয়ে রেখেছেন নাকি? না কি, সবটাই শখ, টাকা ছড়ানোর আনন্দ।

রেক্সোনা আপনার ত্বকের যত্ন নেয়...

ত্বক রাখে কোমল ও উজ্জ্বল!

রেক্সোনায় আছে চারটি প্রাকৃতিক তেলের মিশ্রণ—
কেড, ক্যাসিয়া (দারুচিনি বিশেষ), লবঙ্গ আর টেরিবিন্থ। রেক্সোনা মেখে স্নান করুন— এ আপনার ত্বক রাখে কোমল ও উজ্জ্বল। অঙ্গে অঙ্গে জড়িয়ে রাখে আপনার প্রিয় সুরভি...আপনার ত্বকের যত্ন নেবার স্বাভাবিক উপায়!

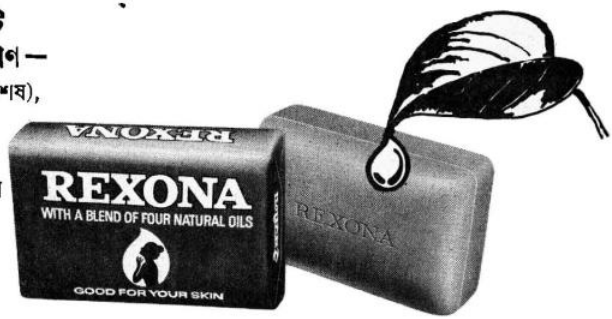

রেক্সোনা আপনার ত্বকের পক্ষে ভালো

হিন্দুস্থান লিভার-এর একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিনটাস-RX.78-1812 BG

বাবু বলল, "একবার ভেতরে গিয়ে দেখতে পারলে হত।"

"থাক, বাবুদা। হুড়োহুড়ি করে লাভ নেই। বাড়িটা দূর থেকে দেখলে এই যথেষ্ট। ভেতরটা পরে হবে। নাও, আর নয়, আলো মরে আসছে, ফেরো।"

বাবুও বুঝতে পারছিল, আর বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যাবে না। বিকেল ফুরিয়ে গিয়েছে, আলো মরে আসছে, খানিকটা পরে অন্ধকার হয়ে যাবে। অন্ধকার হয়ে গেলে কষ্ট হবে ফিরতে।

পাশাপাশি হাঁটার মতন চওড়া রাস্তা নয়, আগুপিছু হয়ে হাঁটছিল দুজনে।

বাবু বলল, "সিংহ আর সান্যাল—এরা কি বন্ধু?"

"তাই মনে হয়।"

"কিন্তু যদি শত্রু হয়?"

"কেন, শত্রু হবে কেন? শত্রু হলে সিংহিবাবু ও-বাড়িতে যাবেন কেন?"

"বাইরে বন্ধু, ভেতরে শত্রু। সিংহিবাবু না তোকে বলেছে, উনি তোর শত্রু নন। কিন্তু উনি জানেন, কে তোর শত্রুতা করছে।"

শিশির বলল, "সিংহিবাবুর কথা বাদ দাও। আমায় যা বলছেন সেটা একটা চালও হতে পারে। বংশীই ঠিক বলেছে। মানুষটি অত সোজা নন।"

বাবু কোনো জবাব দিল না।

অনেকক্ষণ আর কোনো কথাবার্তা নেই। একটা গাড়ি আসার সিগন্যাল দেখা যাচ্ছিল। সবুজ হয়ে রয়েছে সিগন্যাল।

শিশির বলল, "একটা জিনিস কিন্তু বেশ বোঝা গেল।"

"কী?"

"আঙটিটা কিছু নয়। ওটা ব্লাফ।"

"তাই মনে হচ্ছে। এ-রকম ব্লাফ হয়তো আরও পাওয়া যাবে।"

হঠাৎ শিশিরের নজর পড়ল, তাদের উলটো দিক দিয়ে কে যেন এগিয়ে আসছে। লোকটাকে এতক্ষণ নজরে পড়েনি। আশ্চর্য! কোথায় ছিল লোকটা? লুকিয়ে ছিল? লুকোবার মতন জায়গা কোথায়? রেল-লাইনের পাশে ঝোপঝাড়, ঢিবি, একটা ভাঙা কেবিনও পড়ে আছে। এরই কোথাও লুকিয়ে ছিল নাকি?

"বাবুদা, একটা লোক আসছে।"

বাবু দেখল। বলল, "কে?"

"জানি না।"

"এমনি লোক হতে পারে।"

"হ্যাঁ, পারে। আবার নাও পারে। আমার মাথা ফাটাবার চেষ্টা হবার পর থেকেই আমি সাবধান হয়ে গিয়েছি।"

বাবু কেমন ভয় পেয়ে গেল। একটা লোক উলটো দিক থেকে আসছে এটা দেখা গেলেও তার হাতে কিছু আছে কি নেই তা দেখা যাচ্ছিল না।

"লোকটার যদি বদ মতলব থাকে," শিশির বলল, "আজ আমি ছেড়ে কথা বলব না।"

"কী করবি?"

"মারব।"

"মারবি? শুধু-হাতে?"

"বেটার নাকে মারব। নাক দারুণ জায়গা। তুমি দুটো পাথর কুড়িয়ে নাও তো। একটা আমায় দাও।"

বাবু রেল-লাইন থেকে দুটোর বেশি পাথর কুড়িয়ে নিল। একটা পাথর শিশিরকে দিল। শিশির হাতের মুঠোয় রাখল পাথরটা।

"বাবুদা?"

"বল্।"

"লোকটা দাঁড়িয়ে পড়ল।"

"দেখেছি।"

শিশিরও দাঁড়াল। তাকাল ডাইনে বাঁয়ে। রেল-লাইনের গা দিয়ে গড়ানো জমি। দরকার হলে দৌড়নো যেতে পারে। কিন্তু এই সন্ধের মুখে দৌড়নো খুব বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। কোথায় হোঁচট খেয়ে পড়বে কে জানে।

লোকটা দাঁড়িয়ে পড়ে বিড়ি-সিগারেট কিছু ধরাল। দেশলাইয়ের কাঠি জ্বলে উঠল, তারপর আগুনের ফুলকি চোখে পড়ল। মিটমিট করে জ্বলছে।

শিশির এগুতে লাগল।

বাবু বলল, "শুধু-হাতে বেরুনো উচিত হয়নি।"

"সে পরে ভেবো। এখন ওর দিকে চোখ রাখো।"

দু দিক থেকে দুই পক্ষই ক্রমশ মুখোমুখি হতে লাগল। শিশিরের হাতের মুঠো আরও শক্ত হল। পাঁচ-সাত পা তফাত থাকতেই লোকটা আবার দাঁড়াল। শিশিররাও দাঁড়িয়ে

ফরহ্যান্স— দাঁতের ডাক্তারের তৈরী টুথপেস্ট

দাঁত সাফ করার সঙ্গে সঙ্গে আপনার মাড়ি মজবুত করতে সাহায্য করে

মাড়ির গোলমাল হলে এমন কি সুস্থ দাঁতও পড়ে যেতে পারে

দাঁতের ডাক্তাররা বলেন, দাঁত ঠিক মত সাফ না করলে প্লাক নামে জীবাণুর যে পাতলা পর্দা আপনার দাঁত আর মাড়িতে সবসময়ই জড়িয়ে থাকে, তা জমে ওঠে। এই প্লাক দন্তমলে পরিণত হয়ে মাড়ি দুর্বল ক'রে ঠেলে দেয়, ফলে এমন কি সুস্থ দাঁতও পড়ে যেতে পারে। মাড়ির গোলমাল সাধারণ স্বাস্থ্যেরও ক্ষতি করতে পারে।

ফরহ্যান্স মাড়ি রক্ষা করে

ডাঃ ফরহ্যান্সের শক্তিশালী অ্যাস্ট্রিঞ্জেন্ট ক্রিয়ার অদ্বিতীয় ফরমুলা আপনার মাড়ি মজবুত করে তোলে, ফলে আপনি মাড়ির গোলমাল রোধ করতে পারেন। কাজেই, আপনার দাঁত ব্রাশ আর মাড়ি মালিশ করুন, ফরহ্যান্স টুথপেস্ট আর ফরহ্যান্স ডবল অ্যাকশন টুথব্রাশ দিয়ে।

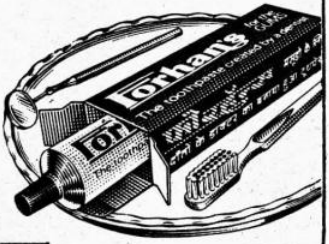

ফরহ্যান্স — মাড়ির জন্যে

Regd. T.M: Geoffrey Manners & Co. Ltd.

25IF-172 BEN

পড়ল। পাজামা আর হাফ-হাতা শার্ট পরা একটা লোক, মাথার চুল ছোট-ছোট, গোল মুখ।

শিশির সাবধানে দু পা এগিয়ে গেল।

লোকটা একেবারে গায়ের কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল,"কিতনা টাইম হুয়া বাবু?"

শিশির দুটো হাতই পিঠের দিকে আড়াল করে রেখেছিল। ঘড়ি দেখার জন্যে হাত সামনে আনল না। বলল, "ঘড়ি নেই।"

লোকটা বিড়িই খাচ্ছিল। হিন্দি-মেশানো বাংলায় বলল, "বাবুলোকের হাতে ঘড়ি না থাকে।" কথায় কেমন যেন টিটকিরির ভাব।

শিশির বলল, "ঘড়িসে তোমার কাম কী? কোথায় যাবে?"

"ওহি কোঠিমে।" বলে সান্যালমশাইয়ের বাড়ি দেখাল।

"আচ্ছা। ওই কুঠিতে কাজ কর?"

"জী।"

"কিসের কাজ কর?"

"গাড়ি চালাই।"

"ড্রাইভার।"

লোকটা এবার পাশ কাটাবার জন্যে পা বাড়াল। শিশিরের পেছনে বাবু। শিশির সাবধানে জায়গা দিল লোকটাকে। বাবু সরে গেল।

কোনো কথা না বলে লোকটা পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

এবার গাড়ি আসার শব্দ শোনা গেল। লোকটাকে পেছন ফিরে দেখল খানিক। তারপর বলল, "চলো বাবুদা।"

স্টেশনের দিকে আবার পা বাড়াল দুজনে। গাড়িটা প্রায় এসে পড়ল। মালগাড়ি। স্টেশনের দিক থেকেই আসছে। এঞ্জিনের আলো পড়ছিল লাইনে। ধবধব করে উঠল এদিকটা।

শিশির বলল, "বাবুদা, লোকটা ড্রাইভার নয়। গাড়ি চালায় না।"

"কেমন করে বুঝলি? চিনিস ওকে?"

"লোকটার বাঁ হাতের কব্জির কাছ থেকে নুলো-মতন। বেঁকা, রোগা। ওই হাতে গাড়ি চালানো যায় না।"

"তুই দেখেছিস?"

"হ্যাঁ। আমি সারাক্ষণ ওর হাতের দিকে নজর রেখেছিলাম।

"তোর তো দারুণ চোখ।"

"ঠকে শিখতে হচ্ছে।"

"ও তাহলে মিথ্যে কথা বলল?"

"কোনো সন্দেহ নেই। আমার মনে হয় লোকটা আমাদের আগেই দেখেছে। হয় ও দেখেছে, কিংবা অন্য কেউ। আমাদের লক্ষ করার জন্যই এসেছিল। কিন্তু কেমন করে এল, কোথা থেকে এল বুঝতে পারছি না।"

আর কথা বলা গেল না। মালগাড়ি যাচ্ছিল। লাইন কাঁপছিল, শব্দ হচ্ছিল বিশ্রী। বাবু বলল, "লোকটা তাহলে সান্যালমশাইয়ের ইনফরমার?"

শিশির বলল, "তাছাড়া আবার কী! আমাদের ওপর চারদিক থেকে এত নজর দেখে বেশ ভয় হচ্ছে, বাবুদা! গভীর ব্যাপার কিছু আছে! তাই না?"

বাবু বলল, "তাই মনে হচ্ছে।" (ক্রমশ)

গ্রন্থের নামকরণ করে থাকেন লেখকেরাই। কিন্তু পৃথিবীর বিখ্যাততম গ্রন্থগুলির একটির লেখকের দেওয়া নাম পাঠকেরা পালটিয়ে দিয়েছিলেন। গ্রন্থটির মূল নাম ছিল 'কমেডি'। দান্তের দেওয়া এই নামেই গ্রন্থটি প্রথম দুশো বছর চলেছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে মহাকবি দান্তের মৃত্যুর দুশো বছর পরে দেখা গেল কমেডির আগে ডিভাইন শব্দটি বসে গেছে। এ নাম দান্তের দেওয়া নয়। তাঁর প্রতি স্বর্গীয় শ্রদ্ধায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই নামে তাঁর পাঠকেরা কমেডিকে অভিষিক্ত করেছেন। সেই থেকে এই অমর গ্রন্থ পৃথিবীতে 'ডিভাইন কমেডি' নামেই পরিচিত।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

সদাশিব

অগ্নিকাণ্ড

চিত্রনাট্য : তরুণ মজুমদার
ছবি : বিমল দাশ

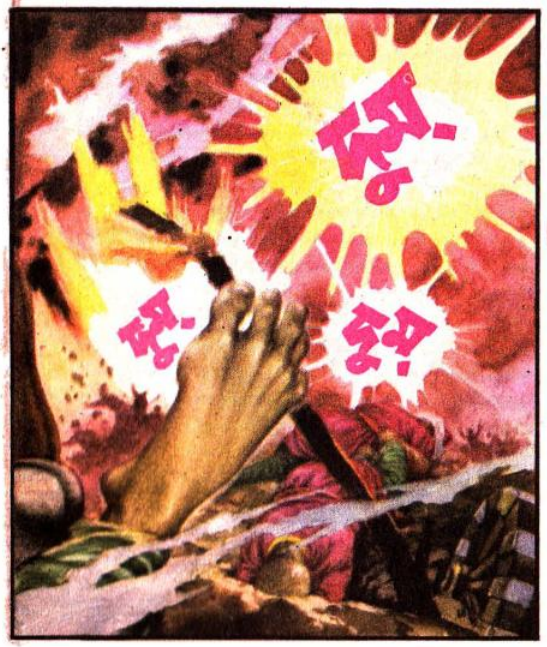

'অগ্নিকাণ্ড'
এখানেই শেষ।

এর পরে শুরু হবে
'দৌড়োদৌড়ি কাণ্ড'

রোভার্সের রয়

অস্ট্রেলিয়ান টুর্নামেন্টের ফাইনালে রোভার্সের কাছে হেরে গিয়ে বসরানের শেখ রয়কে কোচ হিসাবে পেতে চান।
কী বললেন? এক কোটি টাকা?
কেন, আপনি রাজি নন?

বেশ, দু কোটি দেব। সেই সঙ্গে বাড়ি, গাড়ি, চাকর।
দাঁড়ান! দাঁড়ান!
বাস রে, এ যে অনেক টাকা!
যাক, আপনি তাহলে রাজি?
হেসে মাথা নাড়ল রয়...
না। এখন নয়। এখন আমি রোভার্সেই থাকতে চাই, তবে...

আপনার জন্যে ভাল একজন কোচ আমি ঠিক করে দেব।
না, আমরা আপনাকেই চাই!
এবং আপনাকে আমি বসরানে নিয়ে যাবই!
দাঁড়ান... দাঁড়ান!

রেগেমেগে শেখ চলে গেলেন...
যাব্বাবা!
দু কোটি টাকা! ভেবে দ্যাখো রয়!
দেখেছি!
কিন্তু আমি যাব না!
আরে!
হাহাহা!

রোভার্স দল ব্রিটেনে ফিরে যাচ্ছে...
কিন্তু রয়, তোমার স্ত্রীকে একবার জিজ্ঞেস করা উচিত।
খবর্দার, পেনিকে এ-ব্যাপারে তোমরা কিছু বোলো না।
কিন্তু খবর কি চাপা থাকে?
ওই তো দু কোটি টাকার কোচ।
সর্বনাশ! সবাই জেনে গেছে!
শেখ নিশ্চয় খবরটা চাউর করে দিয়েছে?
না, এ-ব্যাপারে আমি কিছু বলতে চাই না!
কিন্তু...
পেনি যদি বসরানে যেতে চায়, তাহলেই সর্বনাশ।
পেনি যেতে চায়!
আমাকে জিজ্ঞেস করলে না কেন? এত টাকা...
কিন্তু টাকাই কি সব?
তোমাকে তো আর সংসার চালাতে হয় না!
না, পেনি, তুমি যা-ই বলো, আমি এখানেই থাকব।
নরবরোর বিরুদ্ধে রোভার্সের খেলার দিনে...
পেনি দেখছি মাঠে আসেনি।
কী ব্যাপার, কে জানে।
ROVERS
ROVERS
রয় আজ এত বাজে খেলছে কেন?
বল নাও মারভিন!
রয়, তুমি বাজে পাস করেছিলে!
সত্যি, এ তো ভাবাই যায় না!
কী করবে রয়? পেনি কি তাকে বসরানে যেতে বাধ্য করবে?
এর পর আগামী সংখ্যায়

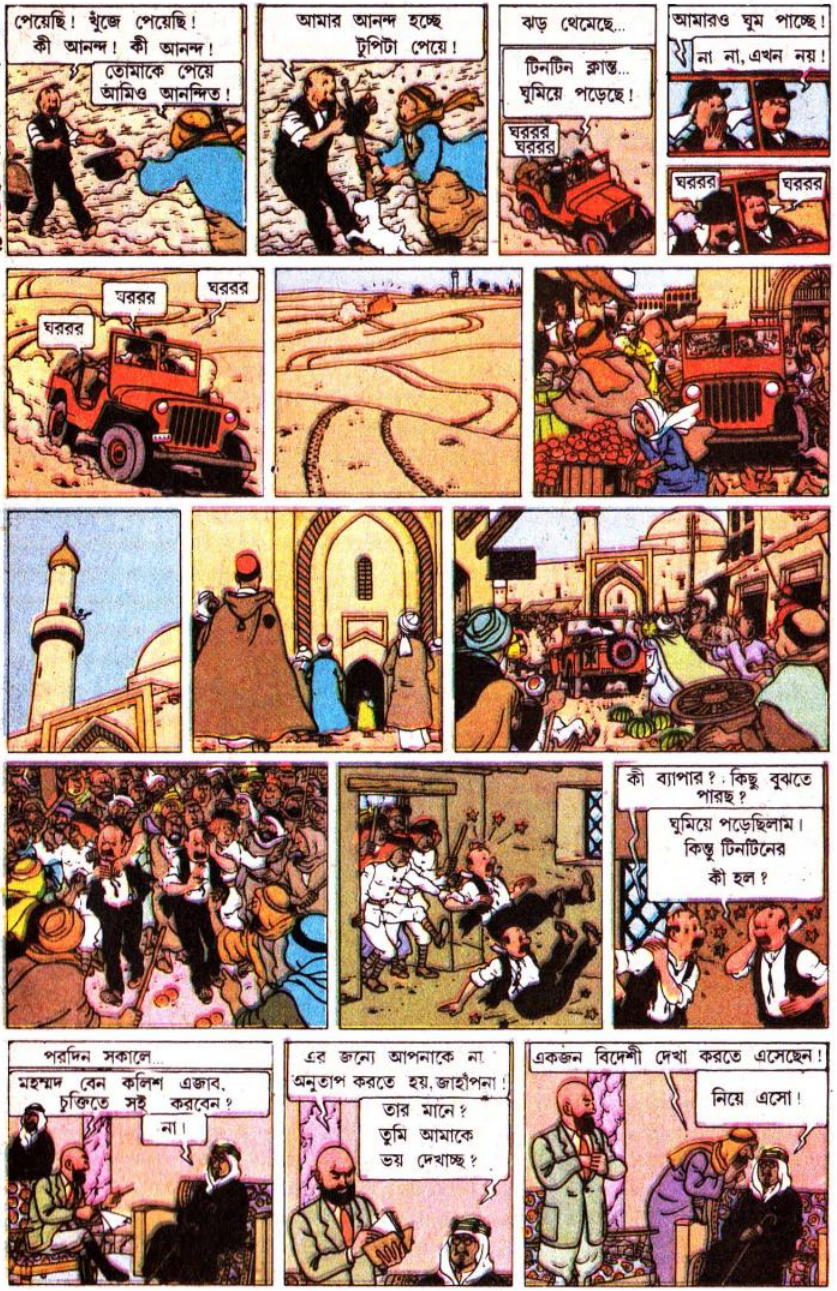
পেয়েছি! খুঁজে পেয়েছি! কী আনন্দ! কী আনন্দ!
তোমাকে পেয়ে আমিও আনন্দিত!
আমার আনন্দ হচ্ছে টুপিটা পেয়ে!
ঝড় থেমেছে...
টিনটিন ক্লান্ত... ঘুমিয়ে পড়েছে!
ঘররর ঘররর
আমারও ঘুম পাচ্ছে!
না না, এখন নয়!
ঘররর
ঘররর
ঘররর
ঘররর
ঘররর
কী ব্যাপার? কিছু বুঝতে পারছ?
ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু টিনটিনের কী হল?
পরদিন সকালে...
মহম্মদ বেন কলিশ এজাব, চুক্তিতে সই করবেন?
না।
এর জন্যে আপনাকে না অনুতাপ করতে হয়, জাহাঁপনা!
তার মানে? তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ?
একজন বিদেশী দেখা করতে এসেছেন!
নিয়ে এসো!

দুই কোম্পানির লড়াই শেষপর্যন্ত কোথায় গিয়ে পৌঁছবে? মানিকজোড়ের অদৃষ্টেই বা কী আছে?

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

শব্দ-সন্ধান

১	২		৩		৪	
৫		৬		৭		
		৮				
৯	১০			১১	১২	
১৩					১৪	

সংকেত : পাশাপাশি : (১) ফলবিশেষ। (৩) বিবাহ-অনুষ্ঠানে মাঙ্গলিক চিহ্ন। (৫) একটি বিখ্যাত বন্দর। (৭) কেউ কাউকে কিসে তেল দিতে উপদেশ দেয়? (৮) আত্মীয়। (৯) আয়না। (১১) পরম করুণাময়। (১৩) রাজর্ষি জনকের ভাই। (১৪) কানের অংশ।

উপর-নীচ : (২) আর-একটি ফল। (৪) রাগিণীবিশেষ। (৬) বিদ্যুৎ। (৭) গোরুজাতীয় তিব্বতী প্রাণী। (১০) বজ্র। (১২) বৃক্ষবিশেষ।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

কৃ	ষ্ণা		বে		ব্যা	স
শা		কে	দা	রা		ফ
নু	ন		ঙ্গ		ত	রী
	ক্ষ	পা		ক	ম্বু	
বে	ত্র		ব		রা	হা
হা		সা	য়	র		জ
লা	ড্ডু		স্য		বা	ত

ধাঁধা

"তোর ঠিক মনে আছে?" ছোটকা আবার জিজ্ঞাসা করল, "সত্যিই এই ধাঁধাটার উত্তর তুই জানিস?"

দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করায় আমি একটু ঘাবড়েই গেলাম। ধাঁধাটা চেনা সন্দেহ নেই, তবে উত্তরটা তক্ষুনি মনে পড়ল না কিছুতেই। অথচ ছোটকা যদি উত্তরটা জিজ্ঞেস করে। কী বলব ভেবে পাচ্ছিলাম না। ছোটকারও ভুরু কুঁচকে আছে। চোখের দৃষ্টি ঠিক যে আমার দিকে তা নয়, কিছুটা অন্যমনস্কভাবে এক পাশে ফেরানো। গভীর চিন্তার সময় এরকমটা হয়। নীচের ঠোঁটটা দাঁতে ধরা। ছোটকার মুখে কিছুক্ষণ বাদে আলতো একটা হাসি ফুটে উঠল। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "ঠিক হ্যায়। নো প্রবলেম। তুই যেটা জানিস, সেটা বড়জোর ২৭-৯-৩-১। তাই তো?"

ততক্ষণে আমারও মুখে হাসি ফুটেছে। হ্যাঁ, এই উত্তরটাই। এতক্ষণ মনে পড়ছিল না। বললাম, "তুমিই তো এটা বলেছিলে আমায়।"

ছোটকা বলল, "বলেছিলাম? তা হবে। কিন্তু সেটা তো ছিল পাল্লার দু-দিকে বাটখারা চাপিয়ে সমাধান করা। কিন্তু যদি একদিকে বাটখারা চাপিয়েই ওজন করতে হয়, তাহলে?"

ছোটকার মাথায় নিশ্চিত নতুন ধাঁধা খেলছে! দেরি না করে আমি তক্ষুনি লিখে ফেলার ব্যবস্থা করে ফেললাম। সেটা দিয়েই এবার শুরু হোক।

প্রথম ধাঁধা॥ একজন দোকানি দোকান চালাবার জন্য বাটখারা কিনবে। এক কেজি থেকে চল্লিশ কেজি পর্যন্ত ওজন করতে পারবে, এবং পাল্লায় একদিকেই বাটখারা বসিয়ে ওজন করতে পারবে, এমনভাবে দোকান চালাতে গেলে ন্যূনপক্ষে কটি বাটখারা কিনবে সে? এবং কোন্ কোন্ ওজনের বাটখারা?

দু-দিকে বাটখারা চাপিয়ে ১ থেকে ৪০ কেজি পর্যন্ত ওজন করার ইচ্ছে থাকলে তাকে চারটে বাটখারা কিনতে হত। ১ কেজি, ৩ কেজি, ৯ কেজি আর ২৭ কেজি। কিন্তু একদিকে বাটখারা চাপাতে হলে কী-কী ওজনের বাটখারা কিনবে সে, সেটাই বলতে হবে।

দ্বিতীয় ধাঁধা॥ পরের সংখ্যাটা কত হবে?

৯, ১২, ২১, ৪৮, ?

তৃতীয় ধাঁধা॥ শব্দটার জট ছাড়াও—

ম রা প শু র

গতবারের উত্তর॥ (১) ১৭ জন ভদ্রলোক, ১৩ জন ভদ্রমহিলা, ৯০ জন শিশু। (২) কেন থাকবে না? শুধু স্বাধীনতা-দিবস হিসেবে ছুটির দিন নয়। (৩) কথাসরিৎসাগর।

সত্যসন্ধ

কিসের ফোটো

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যায় ছিল ছুঁচের ফোটো
ফোটো : তপন দাশ

উত্তর বটে

প্রঃ ষোলোটা কলা দিয়ে নৈবেদ্য সাজিয়ে দিলে কী হয়?
উঃ ষোলোকলা পূর্ণ হয়।
প্রঃ সামনেই শক্ত ম্যাচ, কাকে গোলকীপার খেলাই বলুন তো?
উঃ গোলক ধর-কে খেলিয়ে দেখলে পারো।
প্রঃ আদালতে সাক্ষীদের নাম ধরে ডাকা হয়। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র যখন গোপাল ভাঁড়কে তাঁর হয়ে সাক্ষি দিতে পাঠালেন, কী নামে তাঁকে ডাকা হল?
উঃ সাক্ষীগোপাল।
প্রঃ কবিদের কখন পাখা গজায়?
উঃ কবিপক্ষে।

সুসেন

মজার খেলা

তাস তো সব বাড়িতেই থাকে। তাই এবারের মজার খেলার জন্য আলাদাভাবে কিছু যোগাড় করতে হবে না। শুধু দরকার কোনও বন্ধু, যাকে খেলাটা দেখাবে।

প্রথমে অবশ্য তুমি দেখাবে না। বন্ধুকেই দেখাতে বলবে। সে যখন হাল ছেড়ে দেবে, তখন তোমার পালা। তার আগে খেলাটা শিখে নাও। এক প্যাকেট তাস থেকে যে-কোনও একরকম তাসের—অর্থাৎ হরতন, রুইতন, চিড়িতন, ইশকাপন, এর যে-কোনও একটির—১ থেকে ৯ পর্যন্ত ফোটাঅলা তাস বন্ধুর হাতে দিয়ে বলো, এই নটা তাসকে এমনভাবে তিন সারিতে সাজাতে হবে যে, সোজাসুজি, লম্বালম্বি ও কোনাকুনি—সব দিক থেকেই যোগফল হবে পনেরো।

বন্ধু চেষ্টা করুক। সেই ফাঁকে তুমি শিখে ফ্যালো কীভাবে সাজাতে হবে তাসগুলোকে। আগেভাগে বেশ কয়েকবার অভ্যাস করে নিয়ো কিন্তু, নইলে চটপট সাজাতে পারবে না। আর যত তাড়াতাড়ি উত্তর করে দিতে পারবে ততই তো মজা, তাই না?

নীচের ছবি অনুসারে নটা তাসকে সাজাও। অঙ্কে যোগ করে-করে দ্যাখো, সব দিক থেকেই যোগফল পনেরো হচ্ছে কেমন।

৮	৩	৪
১	৫	৯
৬	৭	২

মজারু

হাসিখুশি

"আমি জানি তোমার বন্ধু উৎপল তোমার সম্বন্ধে মিথ্যে কথা বলে আমাকে ভুল বুঝিয়েছে।"

"উৎপলের মিথ্যে বলাকে আমি গ্রাহ্য করি না। কিন্তু সে যদি আমার সম্পর্কে একটি কথাও সত্যি বলে আমি তার ঘাড় ভেঙে দেব।"

●

"জানেন, শশধরবাবু অদ্ভুত অলস মানুষ। প্রতিদিন এখানে চুপচাপ বসে থাকেন। কিছুই করেন না, শুধু-শুধু সময় নষ্ট করেন।"

"আপনি জানলেন কী করে?"

"আর বলবেন না। আমাকে প্রতিদিন ওঁর গতিবিধির ওপর সারাক্ষণ নজর রাখতে হয়।"

●

"তুমি দোষী না নির্দোষ?"

"সম্পূর্ণ নির্দোষ, ধর্মাবতার।"

"তুমি আগে কখনো জেল খেটেছিলে?"

"আজ্ঞে না হুজুর, সুযোগ হয়নি। চুরি করে আগে কখনো, তো ধরা পড়িনি, এই প্রথম হাতেনাতে ধরা পড়লুম।"

"মাস্টারমশাই, আমি না পাঁচটা ভাষা শিখে ফেলেছি।"

"পাঁচটা ভাষা শিখেছ এই বয়েসে? খুব অন্যায় কথা। কই, বলো তো শুনি।"

"ইয়োকোহামা, আমস্টারডাম, সাংহাই, লিসবন, লস এঞ্জেলিস।"

একজন বক্তা তিন ঘণ্টা বক্তৃতা দেবার পর সামনের সারির এক বিরক্ত শ্রোতাকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার কিছু বলবার আছে?"

"আজ্ঞে, একটাই কথা বলবার আছে। দয়া করে একটু দেখাবেন ঘড়িটা, এখন ঠিক ক'টা বাজে।"

ছবি অহিভূষণ মালিক

পট-জিওনের জাদুকর

অনিরুদ্ধ কর

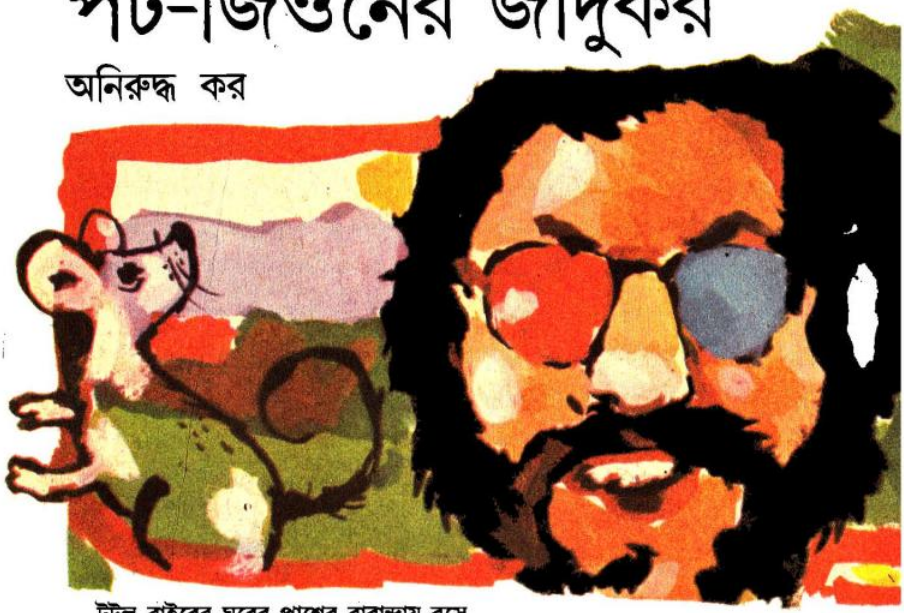

টুটুল বাইরের ঘরের পাশের বারান্দায় বসে ছিল। রতুপিসি আজ সকালবেলায় কলেজ যাবার আগে এক বাক্স রঙ-বেরঙের চক-পেন্সিল দিয়ে গেছে। টুটুল পেন্সিলের বাক্সটা খুলে কয়েকটা পেন্সিল বের করে দেখছিল। টুটুলের খুব ইচ্ছে, রোঁয়া-ওঠা যে কুকুরটা শিব-মন্দিরের পাশে বসে সারাক্ষণ ঝিমোচ্ছে—তার ছবি আঁকে; আর ওই বিরাট জোড়া গির্জার রেলিংয়ের নীচে লম্বা দাড়িওয়ালা যে লোকটা হরেকরকম জিনিসের সওদা নিয়ে বসে—তার ছবি আঁকে। উকিলবাবুর বাড়ির একচিলতে মাঠে যে বুড়ো অস্টিন গাড়িটা ধুলো গায়ে তিনটে চ্যাপ্টা টায়ার আর চারটে ইঁটের ওপর ভর দিয়ে সেই কবে থেকে দাঁড়িয়ে রয়েছে—তার ছবি আঁকে। কিন্তু কিছুতেই ছবিগুলি ধরা দেয় না। কী যে হয় টুটুল বোঝে না।

ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছিল। টুটুল বসে বসে জোড়া-গির্জার ফাঁক দিয়ে দেবদারু গাছটাকে দেখছিল। গাছটায় নতুন পাতা এসেছে। রতুপিসির রেশমি শাড়ির মতো চকচক করছে কচি-কচি পাতাগুলি। লাল মেঝের ওপর টুটুলের আঁকা একটা ছবি।

"বেশ এঁকেছ দেখছি, ভারী চমৎকার হয়েছে ইঁদুরের ছবিটা।" অচেনা কিন্তু মজাদার গলায় কে যেন বলল!

টুটুল চমকে উঠে চেয়ে দেখে দু-চোখে দু-রকম রঙের কাঁচ লাগানো নিকেল ফ্রেমের চশমা লাগিয়ে কাঁচা-পাকা লম্বা দাড়িওয়ালা একটা লোক পুরনো একটা আলখাল্লা পরে কাঁধের ঝোলাটায় একটা হাত ঢুকিয়ে মেঝের ওপর ঝুঁকে ওর আঁকা ছবিটা একমনে দেখছে।

লোকটা আবার বলল, "কিন্তু বেড়ালটা আঁকলে না কী মনে করে? বেড়াল আর ইঁদুর দিব্যি চোর-পুলিশ খেলত!" বলেই লোকটা কয়েকটা চকখড়ির টান দিয়ে একটা হুলো বেড়াল এঁকে ফেলল ইঁদুরটার পেছনে।

যে-সব অচেনা লোক যেচে-যেচে ভাব করতে আসে, তাদের চট করে বিশ্বাস কোরো না—নীলুদা বলে দিয়েছেন।

টুটুল তাই লোকটাকে ভাল করে দেখল। টুটুলের মনে হল, লোকটাকে দেখতে হুবহু সেই সাড়ে-ছ-আনাওয়ালার মতো, যে গির্জার রেলিংয়ের পাশে হরেকরকম জিনিসের সওদা সাজিয়ে বসে।

"বাহ্‌রে বাহ্, বাহ্ রে বাহ্," বলে সে ঝোলা থেকে একটা হাতখানেক লম্বা লাঠি বের করে

ইঁদুরের ছবিটার ওপর ছোঁয়াল।

কী আশ্চর্য! একটু পরেই ইঁদুরটা যেন জ্যান্ত হয়ে ছবিটা থেকে বেরিয়ে এল। টুটুল বারে বারে চোখ কচলে দেখল। না, সত্যিকারের ইঁদুর ওটা। মেঝের ওপর পড়ে-থাকা একটুকরো বিস্কুটের দিকে এগিয়ে গেল ইঁদুরটা। এমন অদ্ভুত কাণ্ড কখনো দেখেনি টুটুল।

"মিউ মিউ মিয়াঁও, তুমভি আভি আও," বলে এবার বেড়ালের ছবিটার ওপর লাঠি ছোঁয়াল সে। দেখতে দেখতে মেঝেতে লেপটে থাকা বেড়ালটা যেন প্রাণ ফিরে পেয়ে চার পা ছড়িয়ে গোটা-দুই ডন দিয়ে আড়ামোড়া ভেঙে মিহি করুণ সুরে মিয়াঁও বলে ডেকে উঠল। তারপর-ই বেড়ালটার নজর পড়ল ইঁদুরের ওপর। আর যায় কোথায়! সঙ্গে সঙ্গে সে তাড়া করল ইঁদুরটাকে, আর ইঁদুরটাও ছুট লাগাল প্রাণপণে।

আপনমনে হেসে লোকটা বলল, "দেখো, মেঝেতে তোমার আঁকা ছবি কিন্তু আর নেই। ছবিটা বিলকুল জ্যান্ত হয়ে গেছে। মরা ছবি থেকে জ্যান্ত ছবি। তোমার আমার মতো জ্যান্ত ছবি।"

"কিন্তু, তা কি সত্যি-সত্যি হয়?" টুটুল অবিশ্বাসীর মতো জিজ্ঞেস করল।

"আখছার, আখছার হয়। এই দেখো-না এবার একটা কুকুর এঁকে বেড়ালটার পেছনে লেলিয়ে দিচ্ছি," বলেই লোকটা একটা কুকুর এঁকে চোখ বুজে তার সেই বেঁটে লাঠিটাকে জাদুদণ্ডের মতো বোলাতে লাগল ছবিটার ওপর।

লোকটার চোখ বোজা দেখে, টুটুল তাড়াতাড়ি কুকুরটার গলায় একটা বকলস আর দড়ি এঁকে একটা আঁকা খুঁটির গায়ে তাকে বেঁধে রাখল।

এদিকে দেখতে-দেখতে কুকুরটা জ্যান্ত হয়ে উঠে ঘৌ-ঘৌ করে ডাকতে লাগল। লোকটা "ছুঃ ছুঃ ছুট যা, পাকড়ো বিল্লিকো" বলতে লাগল। কিন্তু কুকুর আর যায় না।

লোকটি এবার ভাল করে দেখে বলল, "আরে কুকুরটাকে বাঁধল কে? ওহ্, তুমি। শাবাশ, শাবাশ, জিন্দা রহো!"

টুটুল মুচকি-মুচকি হাসছিল। কুকুরটাই শুধু জ্যান্ত হয়নি, খুঁটি, বকলস, মায় দড়িটা পর্যন্ত সত্যি হয়ে উঠেছে। আর মেঝের ছবিটা যেন কোথায় উবে গেছে।

টুটুল জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি জাদুকর? ঐ-ভাবে ম্যাজিক দেখাও?"

লোকটা হেসে বলল, "এ হল পট-জিওনো বিদ্যা। এখন আমি ছাড়া আর দুজন মাত্র এটা জানে। অর্থাৎ বিদ্যেটা প্রায় লুপ্ত হতে চলেছে।"

একটু থেমে লোকটা আবার বলল, "আমরা মনে করি পৃথিবীর সব কিছুই ছবি। কিছু ছবি নড়াচড়া করে—যেমন মানুষ, পাখি, গোরু। আবার কিছু ছবি করে না—যেমন পাহাড়, ব্রিজ, ফুল। যা আঁকা হয়, তা কিন্তু ছবি নয় শুধু, তা হল ছবির ছবি। এইসব ছবিকেই আমি তাদের আসল চেহারায় আসল ছবিতে ফিরিয়ে আনি। দেখলে না, ইঁদুর আর বেড়াল তাদের আসল ছবি হয়ে কেমন ছুটে গেল। একেই বলে পট-জিওনো। এজন্য আমাকে যারা জানে তারা আমাকে পট-জিওনের জাদুকর বলে ডাকে।"

টুটুলের ভারী অবাক লাগছিল। এমন আজগুবি অথচ সত্যি কথা সে কখনো শোনেনি। সে তো নিজের চোখেই ছবিগুলিকে জ্যান্ত হতে দেখেছে। আবার সেটা যে কত অসম্ভব তা তো সে নিজেই জানে। টুটুল কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। দড়িবাঁধা কুকুরটা কেবল ঘৌ-ঘৌ করে ডেকে উঠল।

"শিখতে চাও পট-জিওনো বিদ্যা, অথচ সাহস হচ্ছে না, কেমন?" লোকটা অদ্ভুত মজাদার গলায় বলল।

টুটুল আমতা-আমতা করে বলল, "সত্যি তাই।"

"বেশ, বেশ, আর একদিন হবে। আজ আমার সময় নেই। তাছাড়া তোমার মা তোমাকে ডাকছেন," বলেই লোকটা তাড়াতাড়ি কুকুরটার দড়ি খুলে দিয়ে তারপর মেঝেতে নিজের একটা ছবি এঁকে, সেই বেঁটে লাঠিটা নিজের গায়ে ছুঁইয়ে অদ্ভুত কায়দায় সেই ছবির মধ্যে সেঁধিয়ে গেল।

মায়ের ডাকে চোখ মেলে টুটুল প্রথমে ছবিটা খুঁজল। ছবিটা মেঝেতে রয়েছে।

মা-ও ছবিটা দেখছিলেন। বললেন, "ছবি এঁকে ঘুমিয়ে পড়েছিলি। এখানে ঘুমোয় না। ঘরে চল।"

টুটুল বলতে পারছিল না যে, ছবিটা ওর আঁকা নয়। আর বললেই বা বিশ্বাস করত কে? বড়রা কোনো কথা বিশ্বাস করে নাকি!

ছবি দেবাশিস দেব

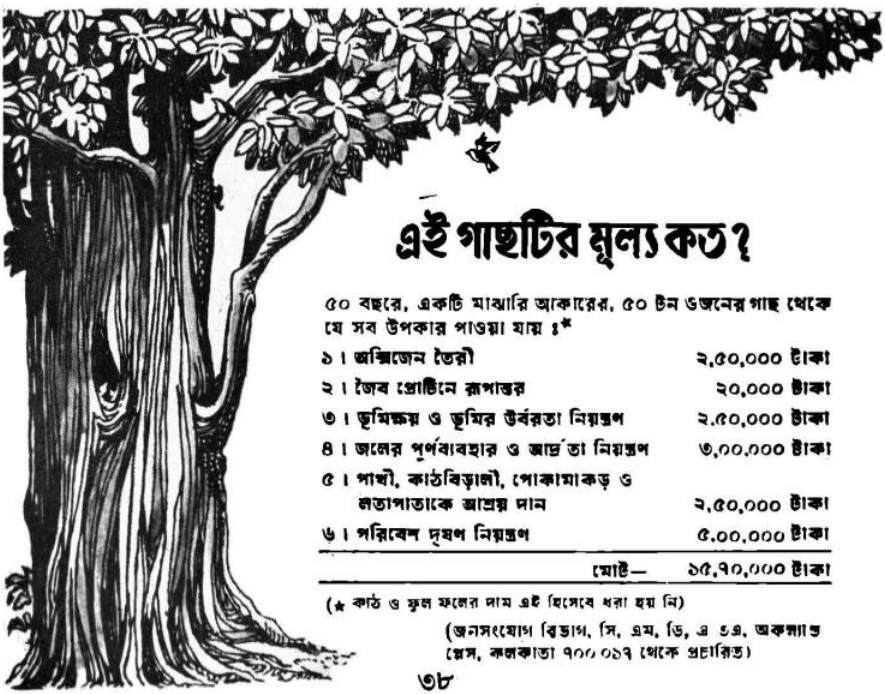

এই গাছটির মূল্য কত?

৫০ বছরে, একটি মাঝারি আকারের, ৫০ টন ওজনের গাছ থেকে যে সব উপকার পাওয়া যায়:*

১। অক্সিজেন তৈরী	২,৫০,০০০ টাকা
২। জৈব প্রোটিনে রূপান্তর	২০,০০০ টাকা
৩। ভূমিক্ষয় ও ভূমির উর্বরতা নিয়ন্ত্রণ	২,৫০,০০০ টাকা
৪। জলের পুর্ণব্যবহার ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ	৩,০০,০০০ টাকা
৫। পাখী, কাঠবিড়ালী, পোকামাকড় ও লতাপাতাকে আশ্রয় দান	২,৫০,০০০ টাকা
৬। পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ	৫,০০,০০০ টাকা
মোট—	১৫,৭০,০০০ টাকা

(* কাঠ ও ফুল ফলের দাম এই হিসেবে ধরা হয় নি)

(জনসংযোগ বিভাগ, সি, এম, ডি, এ ৩এ, অকল্যান্ড প্লেস, কলকাতা ৭০০ ০১৭ থেকে প্রচারিত)

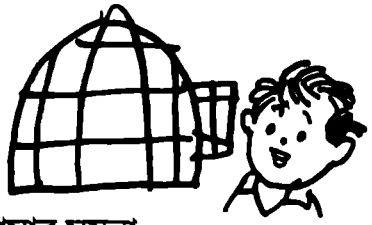

আমার ময়না

রথের মেলা থেকে বাবা আমাকে একটা ময়না পাখি কিনে দিয়েছিলেন। আমি পাখিটাকে রোজ ছোলা-মটর খেতে দিতাম, কিন্তু সে খেত না। মনমরা হয়ে বসে থাকত।

একদিন ভোরে উঠে দেখি পাখিটা খাঁচার শিকল কেটে উড়ে গেছে।

নীল আকাশে যারা ইচ্ছেমতো উড়ে বেড়ায়, তাদের কি ওই ধরনের ছোট খাঁচায় বন্দী থাকতে ভাল লাগে? কিন্তু আমার খুব দুঃখ হল পাখিটা উড়ে গেছে বলে।

মাঝে-মাঝে ময়নার ঝাঁক উড়ে বেড়ায় আকাশে। ওদের দিকে তাকিয়ে মনে হত, আমার ময়নাটাও এদের মধ্যে আছে!

রোজ স্কুলে যাবার সময় খাঁচার মুখ খুলে রেখে যাই আমি। ছোলা-মটর থাকে খাঁচার ভেতর। খাবারের লোভে পাখি যদি আবার খাঁচায় ফিরে আসে! কিন্তু সে আর ফিরে আসেনি।

সুলগ্ন বিশ্বাস (বয়স ৯)

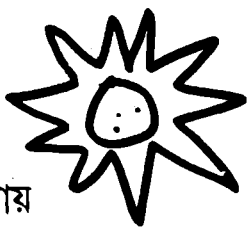

সূর্য কোথায়

হাওয়া-বাতাস পবনদেব
দিল আলো সূর্যদেব
চাঁদের আলো নিবল ওই,
সূর্য দেখা দিল কই?

বিপ্লবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (বয়স ৮)

চোর

একটা লোক একটা বাড়িতে গিয়ে চুরি করল। তার জেল হল। আবার চুরি করল। আবার জেল হল। সে আর চুরি করল না। কারণ, সে বুড়ো হয়ে গেছে।

রাজা মুখোপাধ্যায় (বয়স ৮)

ছোট্ট কাহিনী

ছোট্ট একটা বাড়ি ছিল তাদের,
সামনে একটা চিকচিকে নীল নদী।
তারই পাশে পুরু ঘাসের জমি,
ঠিক যেন এক নরম সবুজ গদি।
সেই ঘাসেতে বসত এসে ও যে,
মুখটা সরল, মিটিমিটি হাসি,
নীল চোখেতে তাকায় দূরের পানে,
রাখাল ছেলে বাজায় কোথায় বাঁশি।
পাগল হাওয়া উঠত বনে বনে,
নদীর জলে জাগত স্রোতের দোল।
ফুরফুরে চুল পড়ত এসে মুখে,
গুনগুনিয়ে গাইত গানের বোল।
সাঁঝের তারা ফুটত আকাশ মাঝে,
তক্ষুনি সে ফিরত নিজের বাড়ি।
জ্যোৎস্না রাতে ঘরের দোরে এসে,
চাঁদ বলত, তোমার সাথে আড়ি।

ঝুমকা ভাদুড়ী (বয়স ১৫)

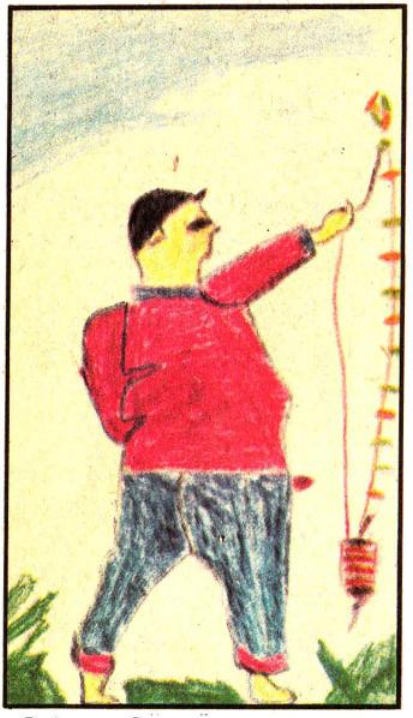

ছবি এঁকেছে বিজয়া চেল (বয়স ১১)

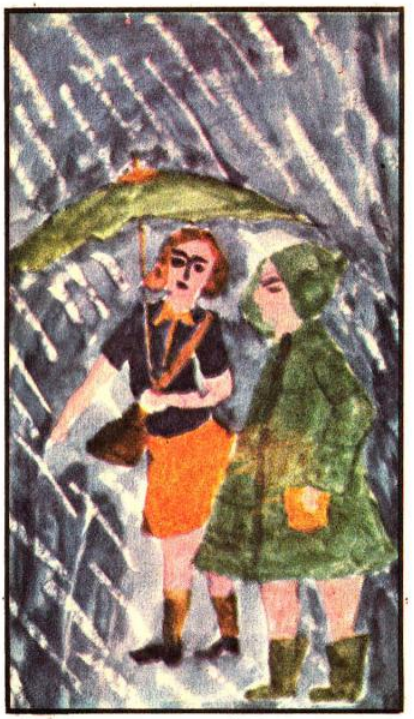

ছবি এঁকেছে মিতালি চৌধুরী (বয়স ১০)

ছবি এঁকেছে নন্দিনী সেনগুপ্ত (বয়স ৮)

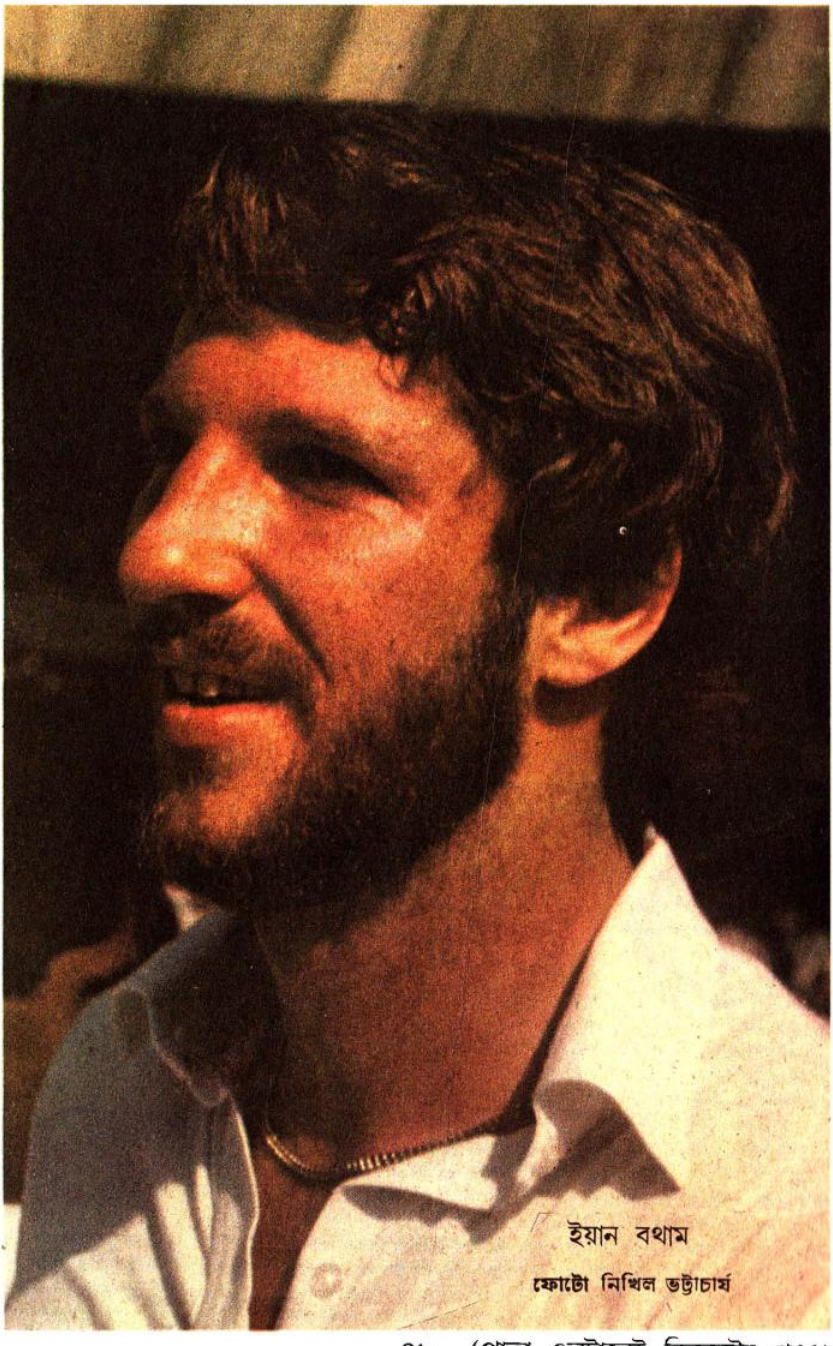

ইয়ান বথাম

ফোটো নিখিল ভট্টাচার্য

সেই পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর অনুভূতির জন্য...

লাইফবয় পার্সোনাল

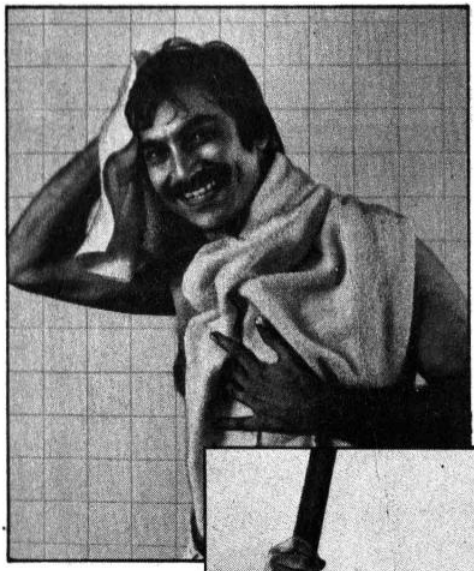

নতুন লাইফবয় পার্সোনাল সেই চির পুরাতন লাইফবয়ের মতই ধুলোময়লার বীজাণু দূর করে...এর সুপ্রচুর ফেনা ও মনমাতানো সুগন্ধ আপনাকে এনে দেয় একটি পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর অনুভূতি। তেমনি আকর্ষণীয় এর গড়ন ও মোড়ক। লাইফবয় পার্সোনাল দিয়েই স্নান করুন... আধুনিক যুগের আধুনিক সাবান।

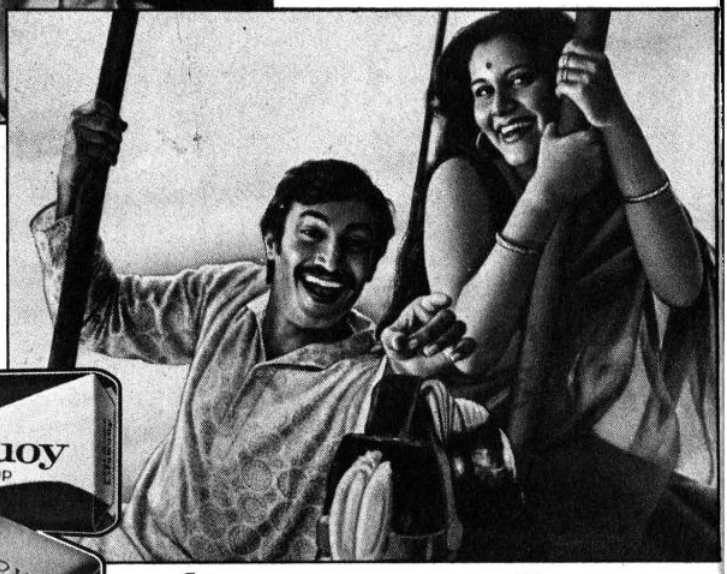

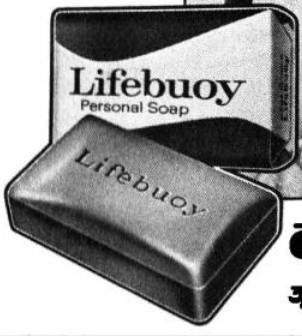

লাইফবয় পার্সোনাল

স্নানে আনে এক অপূর্ব তৃপ্তি

ক্রিকেটের অঘটন

শ্যামসুন্দর ঘোষ

অনিশ্চয়তাই যে ক্রিকেটের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য, তা আরও একবার প্রমাণিত হল এজবাস্টন মাঠে। তৃতীয় টেস্টে ইনিংস পরাজয়ের হাত থেকে অব্যাহতি পেয়ে ইংল্যাণ্ড অবিশ্বাস্যভাবে জিতেছিল ১৮ রানে। এজবাস্টনে চতুর্থ টেস্টও শেষ হয়েছিল নাটকীয় উত্তেজনার মধ্যে। এক্ষেত্রেও জিতেছিল ইংল্যাণ্ড। জয়ের দোরগোড়ায় এসে অস্ট্রেলিয়া পরাজিত হয় ২৯ রানে।

ছয়-টেস্টের সিরিজে ইংল্যাণ্ড ২-১ খেলায় এগিয়ে। প্রথম টেস্টে পরাজয় এবং দ্বিতীয় টেস্টে ড্র হওয়ার পরে ইংল্যাণ্ডের এই সাফল্য নিঃসন্দেহে পরবর্তী দুটি টেস্টে খেলোয়াড়দের মনোবল বাড়াতে সাহায্য করবে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের হাতে দু-দুটি সিরিজে শোচনীয় পরাজয়ের পরে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হারের মুখে এসেও ইংল্যাণ্ড যে কৃতিত্ব দেখিয়েছে তা তাদের লড়িয়ে মনোভাবের পরিচায়ক।

ক্রিকেটের জনপ্রিয়তার মূলে রয়েছে 'অঘটন' শব্দটি। তৃতীয় টেস্টে ইংল্যাণ্ডের অতি বড় সমর্থকও ভাবতে পারেনি যে, ওই খেলায় ইংল্যাণ্ড জিতবে। কিন্তু অঘটন ঘটে। বথামের আক্রমণাত্মক ব্যাটিং ও দীর্ঘদেহী উইলিসের মারাত্মক বোলিংয়ের ফলে ইংল্যাণ্ড ওই টেস্টে জয়লাভ করে। তৃতীয় টেস্টের মতো চতুর্থ টেস্টেও হিরো ছিলেন ইয়ান বথাম। বথামের জন্যেই অস্ট্রেলিয়া জয়ের মুখে এসেও হেরে যায়। দ্বিতীয় ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার মোট রানসংখ্যা মাত্র ১২১। বথাম পাঁচটি উইকেট দখল করেন মাত্র ১১ রানে।

চতুর্থ টেস্টের প্রথম ইনিংসে ইংল্যাণ্ডের ব্যাটিং সুবিধের হয়নি। অথচ উইকেট ছিল ইংল্যাণ্ডের অনুকূলে। টসে ইংল্যাণ্ড জিতেছিল এবং অধিনায়ক ব্রিয়ারলি ব্যাটিংয়ে সাফল্য দেখিয়েছিলেন। দলের ১৮৯ রানের মধ্যে ব্রিয়ারলির নিজস্ব রান ছিল ৪৮। প্রথম দিনের শেষে অস্ট্রেলিয়া করেছিল ২ উইকেটে ১৯। দুটি উইকেটই পেয়েছিলেন ওলড, যিনি জীবনে প্রথম টেস্ট খেলেছিলেন কলকাতার ইডেন উদ্যানে।

ইংল্যাণ্ডের ১৮৯ রানের উত্তরে অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসে করেছিল ২৫৮। ইংল্যাণ্ডের অধিনায়কের মতো অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক কিম হিউজ করেছিলেন দলের সর্বোচ্চ রান (৪৭)। বাম্পারকে কেন্দ্র করে হিউজ ও উইলিসের বিতর্ক দ্বিতীয় দিনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

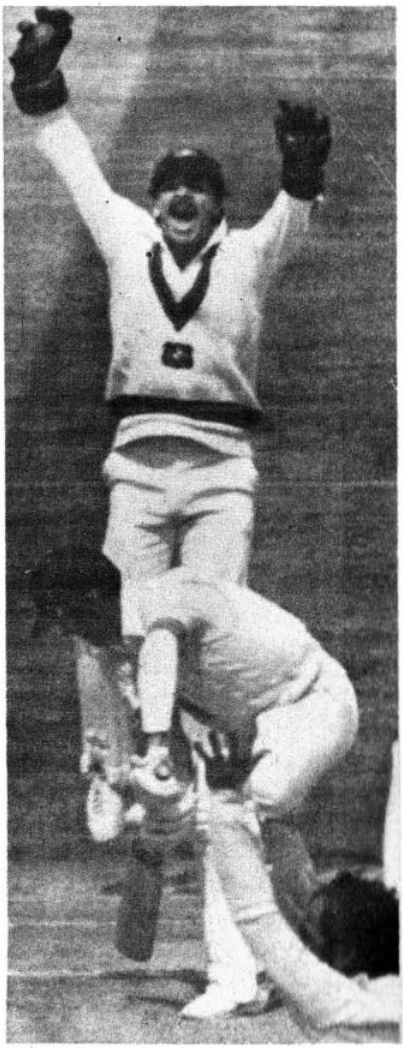

মার্শের হাতে বয়কট আউট

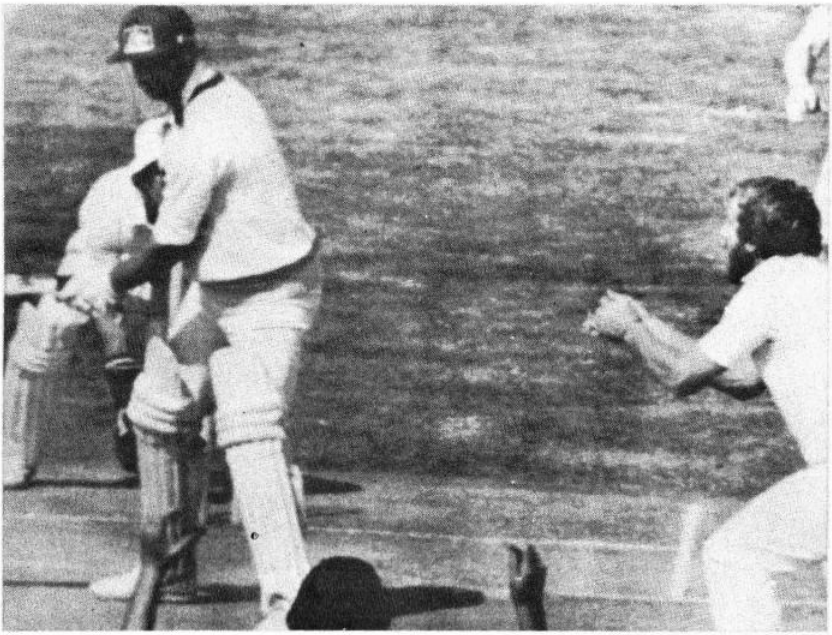

বথামের হাতে ইয়ালপ আউট

ওভার-পিছু বাম্পারের চুক্তি ভেঙেছেন বলে হিউজ উইলিসের বিরুদ্ধে আম্পায়ারের কাছে অভিযোগ তুলেছিলেন। দুই ওভারে উইলিস বাম্পার দিয়েছিলেন পাঁচটি। আম্পায়ার অবশ্য এই ঘটনাটিকে গুরুত্ব দেননি। দ্বিতীয় দিনের শেষে ইংল্যাণ্ড দ্বিতীয় ইনিংসে করেছিল এক উইকেটে ৪৯। অস্ট্রেলিয়ার রান থেকে তখনও তারা কুড়ি রানে পিছিয়ে।

প্রথম ইনিংসের মতো দ্বিতীয় ইনিংসেও ইংল্যাণ্ড বেশি রান করতে পারেনি। এক সময় মনে হয়েছিল, দুশো রানও তুলতে পারবে না। আট উইকেটে ছিল ১৬৭। শেষ পর্যন্ত দলের রান দাঁড়ায় ২১৯-এ। তৃতীয় দিনে বয়কট কাউড্রের সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড ভাঙতে পারতেন। বয়কট আউট হন ২৯ রান করে। আর মাত্র ৬ রান করতে পারলেই কাউড্রের টেস্ট ক্রিকেটের ৭,৬২৪ রান তিনি স্পর্শ করতে পারতেন।

চতুর্থ দিন সকালে অস্ট্রেলিয়া যখন ব্যাটিং করতে নামল তখন কারও পক্ষেই বলা সম্ভব ছিল না ভাগ্য কার দিকে ঝুঁকবে। জয়ের জন্য প্রয়োজন ১৪২ রান, হাতে ন'টি উইকেট। এই অবস্থায় খেলতে নেমে অস্ট্রেলিয়ার রানের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল তিন উইকেটে ৮৭ পর্যন্ত। বর্ডার ও ইয়ালোপের জুটিতে চতুর্থ উইকেটে রান সংগ্রহ হয়েছিল ৫৮। কিন্তু প্রথমে ইয়ালোপ ও পরে বর্ডার তাঁবুতে ফিরে যাওয়ায় খেলাটি কিছুটা ইংল্যাণ্ডের অনুকূলে চলে আসে। কিন্তু তখনও কেউ ভাবতে পারেনি আর মাত্র ১৬ রানে অস্ট্রেলিয়ার বাকি পাঁচটি উইকেট পড়ে যাবে। পাঁচটি উইকেটই পেয়েছেন প্রাক্তন অধিনায়ক বথাম। পাঁচটির মধ্যে তিনটি উইকেট সম্পূর্ণ নিজের কৃতিত্বে। বোল্ড করেছেন কেন্ট, মার্শ ও অল্ডারম্যানকে। পাঁচ উইকেটে ১০৫, কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হল ১২১ রানে।

বথামের পাশে ব্রিয়ারলির ভূমিকাও উল্লেখের দাবি রাখে। স্বল্প রানের পুঁজি নিয়ে ব্রিয়ারলি যেভাবে বোলিং হ্যাণ্ডলিং করেছেন তা তাঁর অধিনায়কোচিত প্রাজ্ঞতারই পরিচায়ক। ইংল্যাণ্ডের বিপর্যয়ের মুখে ব্রিয়ারলি শুধু দলের হালই ধরেননি, দলকে জিতিয়েও দিয়েছেন। আর সেই সঙ্গে বথামকে সাহায্য করেছেন তাঁর স্বাভাবিক ক্রীড়ানৈপুণ্য ফিরে পেতে।

মজার মানুষ 'বিশ'

রাজু মুখোপাধ্যায়

বিখ্যাত ক্রিকেটার বিশ্বনাথের সঙ্গে তোমাদের পরিচয় অনেক দিনের। তিনি কোথাকার ছেলে, তাঁর কবে জন্ম, কোন্ স্কুলে লেখাপড়া করেছেন কিংবা তিনি খেলাধুলো করছেন কতদিন—সব-কিছুই তোমাদের জানা। পৃথিবীর সেরা খেলোয়াড়দের রেকর্ড তোমাদের মুখস্থ, আর বিশ্বনাথের বেলাতেই বা তার ব্যতিক্রম হবে কেন। কিন্তু এই বাঘা খেলোয়াড়টির সঙ্গে তোমরা নিশ্চয়ই মেলামেশার সুযোগ পাওনি। পেলে বুঝতে পারতে কী অদ্ভুত মজার মানুষ তোমাদের এই 'বিশ'।

মনে পড়ছে হায়দরাবাদের একটা ঘটনার কথা। মৈনুদ্দৌলা গোল্ড কাপ খেলতে ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে খেলোয়াড়রা জড়ো হয়েছেন হায়দরাবাদে।

একদিন রাত্রে খাবার টেবিলে বসে মহারাষ্ট্র রঞ্জি দলের খেলোয়াড় মধু গুপ্তে এক বেয়ারার উপর চটে গিয়ে ভীষণ চেঁচামেচি শুরু করলেন। টেবিলের এককোণ থেকে বিশ্বনাথ জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছে।"

মধু বললেন, "দ্যাখো না, চেয়েছি হাফ-তন্দুরি চিকেন, আর দিল কিনা কাঁচা মুর্গি!"

বিশ বেয়ারাকে ডেকে গম্ভীরভাবে বললেন, "তুমি ঠিকই করেছ। ও চেয়েছে হাফ-তন্দুরি, আর তুমি এনেছ তন্দুরি হাফ-কুক্‌ড।"

এবারে তোমাদের বলি কলকাতার এক রঞ্জি খেলার গল্প। ১৯৭৫ সাল। বাংলা বনাম কর্ণাটক। বিশ্বনাথের চমৎকার ব্যাটিং সবাইকে তাক লাগিয়ে দিচ্ছে। হঠাৎ সুব্রত গুহর একটা সোজা বল ফশকে ফেললেন বিশ। বল এসে লাগল প্যাডে। বাংলার ফীল্ডাররা চেঁচিয়ে আবেদন জানালেন। কিন্তু আম্পায়ার মাথা নেড়ে সেই আবেদন নাকচ করে দিলেন।

সেদিন খেলার শেষে মাঠ ছাড়ার সময় বিশ আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আচ্ছা, তোমরা এল-বি অ্যাপীল করলে কেন বলো তো?"

সুব্রত গুহ যেন আকাশ থেকে পড়লেন, "তার মানে! সোজা বল তোমার উইকেট-গার্ড-করা প্যাডে গিয়ে লাগল আর আমরা আবেদন করব না?"

নির্বিকার বিশ হাসতে-হাসতে বললেন, "আরে, অত রেগে যাচ্ছ কেন? যে-হাতে এত ভাল সুইং, সে-হাতের বল কখনও সোজা আর সাধারণ হতে পারে!"

সদ্য ওয়েস্ট ইণ্ডিজ থেকে ফিরে আসার পর ওঁর সঙ্গে দেখা। জিজ্ঞেস করলুম, "বিশ, কেমন লাগল হোলডিংকে?"

"বেশ সুন্দর চেহারা। আস্তে-আস্তে কথা বলেন। ভারী শান্ত ছেলে...."

আমি হেসে বললুম, "আমি হোলডিংয়ের স্বভাব-চরিত্রের কথা জানতে চাইছি না। আমি বলছি, অত ফাস্ট বল দেখতে অসুবিধে হত না তোমার?"

"না, না, একদমই না," বিশ বললেন, "ওঁর বল দেখাই যেত না, দেখতে চেষ্টাও করতুম না।"

"সে কী! তা হলে খেলতে কী করে?" আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলুম।

"শব্দ শুনে।"

"তার মানে?" আমি আবার প্রশ্ন করলুম।

"শন্ শন্ শব্দ পেতুম ওঁর বলের। যেদিকে শব্দ হত আমি তার অন্যদিকে চলে যেতুম।"

PRASA/PGF/81

স্থাপিত ১৯৩২

দি পিয়ারলেস
জেনারেল ফাইনান্স
এ্যাণ্ড ইনভেস্টমেন্ট কোং লিঃ

রেজিস্টার্ড অফিস ঃ পিয়ারলেস ভবন,
৩, এসপ্লানেড ইস্ট, কলিকাতা ৭০০ ০৬৯

॥ ২৮ ॥

উনিশশো সাতান্নর আরও দুটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। সেবার মোহনবাগানের হয়ে রোভার্স খেলতে গেলাম। আমরা ট্রফি পাইনি, তবে টাটা স্পোর্টসকে দারুণ খেলে হারিয়েছিলাম, মনে আছে। দ্বিতীয় গোলটি আমিই করেছিলাম; প্রথম ও তৃতীয় গোল পেয়েছিলেন যথাক্রমে চুনী গোস্বামী এবং এস দত্ত।

সাতান্নতেই সুদানের জাতীয় দল কলকাতায় আই. এফ এ. একাদশের সঙ্গে প্রদর্শনী ম্যাচ খেলে গেল। আমাদের টীম ছিল এইরকম : সনৎ শেঠ, রহমান ও শৈলেন মান্না (অধিনায়ক); কেম্পিয়া, আমেদ হোসেন ও রাম বাহাদুর; পি কে ব্যানার্জি, চুনী গোস্বামী, ওমর, বলরাম এবং এস রায় (কানাইয়ান)।

সুদান দল তিন ব্যাক প্রথায় খেললেও আমাদের আক্রমণের মুখে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। প্রথমে অবশ্য আমরা এক গোলে পিছিয়ে পড়েছিলাম। বলরাম গোল শোধ করার পর ওমর আমাদের এগিয়ে দিলেন। চুনীর পাস থেকে তৃতীয় গোলটি আমিই করি।

উনিশশো আটান্নর ফেব্রুয়ারিতে হায়দরাবাদে বসল সন্তোষ ট্রফির আসর। হায়দরাবাদের তিন বিখ্যাত ফুটবলার এই প্রথম বাংলার জার্সি পরলেন—হায়দরাবাদেরই বুকে। সালাম, আমেদ হোসেন এবং রহমতুল্লা প্রথম ম্যাচেই মাঠে যথেষ্ট হাততালি পেলেন। প্রথম দিন এই তিনজনের সঙ্গে অন্য আটজন : সনৎ শেঠ, রহমান, কেম্পিয়া, নিখিল নন্দী (অধিনায়ক), পি কে ব্যানার্জি, কেষ্ট পাল, চুনী গোস্বামী এবং রামন।

রামনের তখন বয়স হয়েছে, বাংলা দলে আসার কথা নয়। কিন্তু অনুমতি না-নিয়ে প্রদর্শনী ম্যাচ খেলার জন্য গোটা ইস্টবেঙ্গল টীমকে আই. এফ. এ সাসপেণ্ড করায় বলরাম বা কিট্টু টীমে ছিলেন না।

প্রথম খেলায় অন্ধ্রকে সহজেই ৩—০ গোলে হারালাম। আমি পরপর দুটি গোল করার পর শেষ গোলটি করলেন রহমতুল্লা। অন্ধ্রের গোলরক্ষক স্যামুয়েল কেটন দারুণ খেললেন। অন্ধ্রের এক তরুণ ফরোয়ার্ড বেশ কয়েকবার আমাদের রক্ষণভাগকে বিপদে ফেললেন। তখন অবশ্য জানতাম না, তিনি অদূর ভবিষ্যতে কলকাতায় এসে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেণ্টার ফরোয়ার্ডে পরিণত হবেন। আপ্পালারাজুকে সেই প্রথম আমরা দেখি।

কোয়ার্টার ফাইনালেও সেই তিন গোলেই জিতলাম। রহমান, সালান, কেষ্ট পাল এবং রামনের জায়গায় টীমে এলেন মুস্তাক আমেদ, সুশীল গুহ, দামোদরন এবং কানাইয়ান। আমি প্রথম গোল করার পর বাকি দুটি গোল করলেন চুনী গোস্বামী এবং দামোদরন।

সেমিফাইনালে আমাদের খেলতে হল বোম্বাইয়ের বিরুদ্ধে। সুশীল গুহ, আমেদ হোসেন এবং দামোদরনের জায়গায় এলেন রহমান, সালান এবং কেষ্ট পাল।

এই ম্যাচে আমাকে দারুণভাবে নজরবন্দী

নিখিল নন্দী

"নিখুঁত পরিষ্কার"

"হুইল যে কি জিনিষ, আমার বৌমাটি তো তা জানতোই না। এইসব নতুনের দলেদের কি আর বলব, এখনও সেই পুরোনপন্থী হয়েই রয়েছে! হুইল-এ যে কত সাশ্রয় হয় তা ওকে বোঝালাম—আর এও বললাম যে, প্রতিটি বার-এ চারটি ক'রে ভাগ থাকে। আর তারপর ও এই বিপুল ফেনার রাশি আর কাপড়ের সমস্ত ময়লা ধুয়ে বেরিয়ে যেতে দেখে তো একেবারে অবাক! হুইল-এ কাপড় কাচলে কাপড় পরিষ্কারও হয় সাবানের চেয়ে বেশী আর কাপড় ধোয়াও যায় অনেক বেশী! তাই তো এখন হুইল-এর ওপর ওর দারুণ বিশ্বাস জন্মে গেছে—সাবানের আর দরকারটাই বা কি বলুন তো?"

হুইল

দারুণ ধোলাই শক্তি- চড়া দাম থেকে মুক্তি!

হিন্দুস্থান লিভার-এর একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিনটাস-WL.12-1810 BG

করে রাখলেন ডেভিড সলোমন। উনিশশো ছাপ্পান্নর অলিম্পিক টীম থেকে দুর্ভাগ্যক্রমে বাদ পড়েছিলেন সলোমন। এমন কড়া ধাতের নাছোড়বান্দা ডিফেণ্ডার আমি কমই দেখেছি। আমি অন্য প্রান্তে সরে এলে সলোমনও আমার সঙ্গে-সঙ্গে চলে আসছিলেন।

কর্নার কিক থেকে বলপেয়ে চমৎকার ভলি নিলেন বোম্বাইয়ের সেণ্টার ফরোয়ার্ড সুগুনান। সনৎ শেঠ কোনোরকমে রুখলেও, বল সুগুনানের সামনে এসে পড়ল। তিনি তখন মাটিতে পড়ে আছেন। ঐ অবস্থায়, নিজেদের গোলের দিকে মুখ করেই সামান্য উঠে পিছনে বল তুলে দিলেন। সনৎ শেঠের মাথার ওপর দিয়ে বল গোলে ঢুকল।

সেই গোল আর কিছুতেই শোধ হতে চায় না। চুনী আর রহমতুল্লা অনেক আক্রমণ গড়লেন। আমিও কয়েকবার এগোলাম। কিন্তু প্রত্যেকবারই মোক্ষম সময়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছিলেন ঐ ডেভিড সলোমন।

একবার সলোমনকে কাটিয়ে চুনীকে দিলাম, চুনী গোলের জন্য বল সাজিয়ে দিলেন কানাইয়ানকে। কিন্তু কানাইয়ান পাঁচ গজ দূর থেকে বল বাইরে মারলেন। এরপর চুনীর দুর্দান্ত হাফভলি বোম্বাইয়ের ব্যাক সেনিলের গায়ে লেগে বাইরে গেল, সেনিল যন্ত্রণায় বসে পড়লেন।

শেষ পর্যন্ত গোল শোধ হল খেলা শেষ হওয়ার মাত্র বারো মিনিট আগে। মাঝমাঠে বল ধরে সলোমনকে আউটসাইড ডজে বিভ্রান্ত করলাম। সেনিলকে কাটাতেই দেখি, পেনালটি বক্সের মাথায় পৌঁছে গেছি। আর দেরি করার কী মানে হয়? ডান পায়ে শট নিলাম। ভারতবিখ্যাত গোলরক্ষক নারায়ণ নড়বারও সময় পেলেন না।

হাজার-হাজার দর্শক অভিনন্দন জানালেন; কারণ সেদিন আমরা হারার খেলা খেলছিলাম না। আবার ডান দিক দিয়ে ঢুকে সেণ্টার করলাম, চুনীর শট নারায়ণ চমৎকারভাবে রুখে দিলেন। আর একবার আমার সেণ্টারে নিখুঁত হেড করলেন চুনী আবার নারায়ণ দক্ষতার চূড়ায় উঠলেন।

খেলা শেষ হতে তখনও ছয় মিনিট বাকি। আমাদের চাপে বোম্বাই প্রায় কোণঠাসা। হঠাৎ পাল্টা আক্রমণ থেকে সেণ্টার করলেন জো ডিসা। রহমান কোনোরকমে পা ঠেকালেন, কিন্তু বল চলে গেল বোম্বাইয়ের লেফ্‌ট ইনসাইড জাফরের পায়ে। জাফর উঁচু শট নিলেন, আমাদের গোলকীপার সনৎ শেঠ আর ব্যাক মুস্তাক আমেদ, দুজনেই বল লক্ষ করে উঠে নিজেরাই ধাক্কা খেয়ে মাটিতে পড়লেন। সনতের হাত ছুঁয়ে বল আবার ডিসার পায়ে গেল। ডিসা কোনো ভুল করলেন না।

শেষ চেষ্টা করে দেখলাম। আমার এবং চুনীর দুটো জোরালো শট নারায়ণ রুখে দিলেন। ভাল খেলেও আমাদের বিদায় নিতে হল।

অন্যদিক থেকে ফাইনালে উঠে চ্যাম্পিয়ন হল হায়দরাবাদ। সেমিফাইনাল এবং ফাইনালে হ্যাটট্রিক করলেন নতুন তারকা সেণ্টার ফরোয়ার্ড কানন।

ফাইনালের দু'দিন পরে একটা প্রদর্শনী ম্যাচে চ্যাম্পিয়ন হায়দরাবাদ খেলল অবশিষ্ট ভারতীয় একাদশের বিরুদ্ধ। আমরা ৪-৩ গোলে জিতলাম। দ্বিতীয় এবং চতুর্থ গোল আমি করলাম। অন্য দুটি গোল করলেন দামোদরন এবং স্বামী কানন (সার্ভিসেস)।

এই ম্যাচের আগের দিন থেকেই আমার জ্বর। এম দত্তরায় পরে বলেছিলেন, "আমি

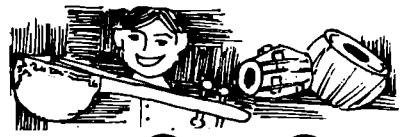

পদ্য লিখেছি

অমলকান্তি ঘোষ

সঙ্গীত নিয়ে পদ্য লিখেছি
তান লয় সুর গিটকিরি
জুড়েও দিয়েছি সুন্দর মিল
শব্দটা হল 'ফিটকিরি'।
পদ্যটা আমি যাকেই শোনাই
মৃদু হেসে বলে, "বেশ বেশ ভাই,
যদি বেঁচে থাকো মহাকবি হবে।"
আচ্ছা, এটা কি টিটকিরি!

আগেই বুঝতে পেরেছিলাম তোর জলবসন্ত হচ্ছে। বলিনি, কারণ একজিবিশন ম্যাচটায় তোর খেলা জরুরি ছিল।"

বুঝতেই পারছ, শেষ পর্যন্ত আমার বসন্ত-রোগ হয়েছে দেখে অনেকেই ভয় পেয়ে গেল। ফেরার পথে ট্রেনে চব্বিশ ঘণ্টা আমার শুশ্রূষা করলেন ভারালু। কতবার যে আমার মাথায় জলপটি দিলেন আর স্টেশনে-স্টেশনে নেমে ডাব কিনে আনলেন!

ম্যানেজার সরোজ বসু আমার মাথার কাছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকলেন। এমন ম্যানেজার তো আর দেখলাম না। উনিশশো পঞ্চান্নয় আমার প্রথম আন্তর্জাতিক সফরেও তিনিই ছিলেন ম্যানেজার। জমিদার-বংশের ছেলে সরোজ বসু মাঠ থেকে কিছু নিতে আসেননি, দিতেই এসেছিলেন।

মাঝে মাত্র ছয় সপ্তাহের বিরতি, তারপরই কটকে বারবাটি স্টেডিয়ামে শুরু হয়ে গেল টোকিও এশিয়ান গেমসের জন্য প্রশিক্ষণ শিবির। সবে বসন্তরোগ থেকে উঠেছি। তবু প্রচণ্ড অনুশীলনে নেমে যেতে হল, কারণ কোচ হলেন বাঘা সোম। বারবাটি স্টেডিয়াম তখন ভৈরব মহান্তির চেষ্টায় সবে গড়ে উঠছে। এপ্রিলের কটকে ঝাঁ-ঝাঁ রোদ, আর তার মধ্যে বাঘাদার ট্রেনিং। জনার্দন, চানো, দামোদরন, রহমতুল্লা, কানন—ওঁরা আগে কখনও বাঘাদার হাতে পড়েননি। যাঁদের অভিজ্ঞতা ছিল, তাঁরাও ক্লান্ত হয়ে পড়তেন। বিশেষ করে সিনিয়র ফুটবলাররা এত ধকল সহ্য করতে পারছিলেন না।

একদিন দুটো লাইন করে আমরা আস্তে-আস্তে দৌড়চ্ছি। দুই লাইনের সামনে দুই মানুষ-যন্ত্র কেম্পিয়া এবং নিখিল নন্দী—যাঁরা চাইলে একটানা একশো আশি মিনিট ফুটবল খেলতে পারতেন।

বাঘাদার হঠাৎ ইচ্ছা হল, সিনিয়র ফুটবলারদের কাবু করবেন। তিন পাক 'জগিং'য়ের পর বাঘাদা বললেন 'লং স্ট্রাইড্‌স'। লম্বা পা ফেলে দৌড়ে আরও তিন পাক ঘোরা হয়ে গেল। বাঘাদা কিছুতেই থামতে দিচ্ছিলেন না, আঠারো পাকের সময় মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন নুর। আজিজের অবস্থাও কাহিল। দৌড়তে-দৌড়তেই চুনী জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, তোর বাঘাদা ঠিক কী চান, বল তো?"

আমার অবস্থাও তো করুণ। সবে অত বড় অসুখ থেকে উঠেছি। তবু, আমাকে চুপচাপ সব করে যেতে হল, কারণ আমি বাঘাদার ক্লাব টীমের ফুটবলার। তাঁর ট্রেনিংয়ে আমি কাহিল হলে তো বাঘাদাই অস্বস্তিতে পড়বেন।

বাঘাদা নিজে মহাযুদ্ধের সময় সেনাবাহিনীতে ছিলেন। নিয়মশৃঙ্খলা দারুণভাবে মানতেন এবং মানাতে চাইতেন। কেউ প্র্যাকটিস করতে না চাইলেই ভাবতেন, ফাঁকি দেবার চেষ্টা! কারো যে শরীর খারাপ থাকতে পারে তা বাঘাদা বিশ্বাস করতেই চাইতেন না।

কটকেই হঠাৎ শোনা গেল যে, বাংলার অধিনায়ক নিখিল নন্দী এশিয়ান গেমসে ভারতীয় দলে থাকবেন না। নিখিলদা যেভাবে প্রাণপাত পরিশ্রম করতেন, তাতে বাদ যাওয়াটা সত্যিই মর্মান্তিক। শেষ পর্যন্ত অবশ্য নিখিল নন্দী টীমে থাকলেন। শুধু যে টীমে থাকলেন, তা নয়, ভারতীয় দলের সহ-অধিনায়কও হলেন। একাগ্রভাবে নিষ্ঠাবান ফুটবলার নিখিল নন্দীর এই সম্মান প্রাপ্য ছিল। (ক্রমশ)

যেখানেই যান, যে-কাজই করুন
স্বাচ্ছন্দ্যময় চলা-হাঁটার উপরই
নির্ভর করছে আপনার সাফল্য।

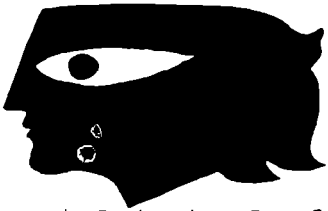

রাজুর তৈরী টেকসই গেঞ্জী,জাঙ্গিয়া,
মোজাই আপনাকে জোগাতে পারে
সেই বাড়তি স্বাচ্ছন্দ্য, এবং কম
খরচে। কেনার সময় খোঁজ করবেন-

১। প্রেসটিজ রঙীন জাঙিয়া
২। রঙীন ড্রয়ার্স
৩। ডাক্কর জাঙিয়া
৪। ফেদার-ফ্রিট রিব গেঞ্জী
৫। ইজিপসিয়ান গেঞ্জী
৬। কুলফিল গেঞ্জী

গেঞ্জী জাঙ্গিয়া
মোজার রাজা

RAJU

হারানো কাকাতুয়া

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আগের কথা : গবাকে কেউ বলে পাগল, কেউ বিজ্ঞানী, কেউ চোর, কেউ স্পাই। উদ্ধববাবুর কেনা কাকাতুয়া বলে, "আলমারিতে টাকা নেই, অন্য জায়গায় আছে।" পাখিটিকে অনেকেই হাতাতে চায়। উদ্ধবের কর্মচারী নয়নকাজলও লোভী। উদ্ধবের ছেলে রামুর গৃহশিক্ষক যুধিষ্ঠির জর্দাপান খান। গবার ঘরে মাঝরাতে যে ঢুকেছিল, তার মুখেও জর্দার গন্ধ। হরিহর পাড়ুইয়ের খুনের মামলার জেল-পালানো আসামি গোবিন্দ মাস্টার মুখোশ পরে সার্কাসে খেলা দেখাত। গবার মাধ্যমে রামু তার সন্ধান পায়। গোবিন্দর গোপন আশ্রয়ে কে আগুন লাগায় ? সাতনা ? গবা বলে, কাশিমের চরে খুন হবার সময় হরিহর পাড়ুই বলেছিল, পাখি সব জানে। সেই পাখি ইতিমধ্যে উদ্ধবের বাড়ি থেকে লুঠ হয়েও ফের ফিরে আসে। কিন্তু আবার লুঠ হয়। ডাকাতরা এবারে রামুকেও ধরে নিয়ে গেছে। নয়নকাজলও নিখোঁজ। তারপর...

॥ ২১ ॥

রামু নিরুদ্দেশ, কাকাতুয়া বেহাত, নয়নকাজল হাওয়া। বাড়িতে প্রচণ্ড ডামাডোল। এরই মধ্যে সকলের চোখের আড়ালে একটা নতুন কাজের লোক বহাল হয়ে গেল।

উদ্ধববাবুর প্রেশার বেড়ে গেছে, তিনি শয্যা নিয়েছেন। ডাক্তার এসে দেখে নড়াচড়া বারণ করে গেছেন। কিন্তু উদ্ধববাবু কেবল এপাশ-ওপাশ করেন। তাঁর ছোট ছেলেটা দুষ্টু ছিল বটে, তিনি শাসনও করতেন তাকে, কিন্তু এখন তার জন্য বুক ফেটে যাচ্ছে কষ্টে। ছেলেটাকে কি ওরা জ্যান্ত রাখবে ?

রাত বেশ গভীর হয়েছে। ঘরে একটা মৃদু আলো জ্বলছে। উদ্ধববাবু ঘুমোনোর বৃথা চেষ্টা ত্যাগ করে উঠে বসে অনামনস্ক ভাবে চেয়ে রইলেন। ঠিক সেইসময়ে ভিতরবাড়ির দিককার দরজাটা নিঃশব্দে খুলে গেল। উদ্ধববাবু হাঁ করে চেয়ে রইলেন।

ঘরে ঢুকল নতুন কাজের লোকটা।

"কী চাও ?" উদ্ধববাবু জিজ্ঞেস করলেন।

"আজ্ঞে আমি একটা কথা বলতে এসেছিলাম।"

"এত রাতে কথা কিসের ?"

"আজ্ঞে টের পাচ্ছি রামুর চিন্তায় আপনার ঘুম হচ্ছে না। শরীরও ভাল যাচ্ছে না আপনার। তাই বলতে এসেছিলাম গুপ্তধনের হদিস যতক্ষণ না পাচ্ছে ততক্ষণ ওরা রামুর ক্ষতি করবে না। তাতে ওদের লাভ নেই।"

"কিন্তু হদিস পেতে আর বাকি কী ? কাকাতুয়া তো ওদের হাতে।"

"তা বটে। কিন্তু মজা হল, কাকাতুয়াকে ঠিক-প্রশ্নটি না করা গেলে সে কিছুতেই হদিস বলবে না। এই কাকাতুয়াটাকে নিয়ে আমি বহুকাল ধরে চিন্তা করছি। হরিহর পাড়ুই পারেনি, বিশু পারেনি, আপনারাও পারেননি। অনেক ভেবে দেখেছি, পাখিটাকে ঠিক প্রশ্নটি যতক্ষণ করা না হচ্ছে, ততক্ষণ তার মুখ থেকে আসল কথাটি বেরোবে না।"

"প্রশ্নটা তুমি জানো ?"

"আন্দাজ করতে পারি। কিন্তু যারা পাখিটা চুরি করেছে তাদের মাথা অত সাফ নয়। পাখির কাছ থেকে তারা কথা বের করতে পারবে না। আপনি নিশ্চিন্তে ঘুমোন। যা করার আমি আর গবাদা মিলে করব।"

"গবা বলছিল, তুমি নাকি সারকাসের খেলোয়াড়।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু কথাটা পাঁচকান করবেন না।"

উদ্ধববাবু চোখ বুজে বলেন, "সব বড় গোলমাল ঠেকছে হে । এক সারকাসের খেলোয়াড় বাড়ির চাকর হয়ে ঢুকল। বাড়ির পুরনো চাকর ডাকাতের দলে গিয়ে ভিড়ল। ছেলেটা গুম হয়ে গেল। সব বড় গোলমাল ঠেকছে।"

নতুন লোকটা মাথা চুলকে বলল, "আজ্ঞে তা আর বলতে। তবে কিনা আমি লোক খারাপ নই।"

"তা কে জানে বাপু। আমার আর কাউকে বিশ্বাস হয় না। তবু তুমি যখন বলছ তখন একটু নির্ভর করেই দেখি ।"

"আমি বলি কি বাবু, আপনি বরং শুয়ে শুয়ে দরবারি কানাড়ার মুখটা গুনগুন করতে থাকুন। ঘুমের সবচেয়ে বড় ওষুধ হল গান।"

উদ্ধববাবু কটমট করে লোকটার দিকে চাইলেন। ভাল করে দেখে তাঁর মনে হল লোকটা ঠাট্টা করছে না। তখন খুশি হয়ে বললেন, "আমার গানের কথা তোমায় কে বলল?"

"কেউ বলেনি। ভাল গাইয়ের গলা কথাবার্তায়ও ফুটে ওঠে। কালে খাঁ সাহেব যখন চাকরকে বকতেন বা রান্নার নিন্দে করতেন, তখনো সমঝদার লোক 'কেয়াবাত, কেয়াবাত' করে উঠত। তাছাড়া বড় গাইয়ের বাড়ির গোরু কুকুর কি পোষা পাখির গলায় পর্যন্ত সুর এসে যায়। আপনার নেড়ি কুকুরটার গলায় আজ সন্ধেবেলাতেই আমি একটা সাপটা শুনেছি।"

"বলো কী?" উদ্ধববাবু খুবই অবাক ও উত্তেজিত হল।

লোকটা বিনয়ে হেসে হাত কচলে বলল, "সুর এমনই জিনিস যে, চেপে রাখা যায় না। যার গলায় সুর আছে, সে শত চেষ্টা করেও কোনোদিন বেসুর বের করতে পারবে না গলা থেকে। আপনার যেমন, একটু আগে শুয়ে শুয়ে 'আঃ উঃ' করছিলেন, আমি দরজার বাইরে থেকে শুনতে পাচ্ছিলাম। শুনলাম তার মধ্যেও সুর আছে।"

উদ্ধববাবু এত দুঃখেও হাসলেন। মাথা নেড়ে বললেন, "সমঝদারই নেই হে দেশে, সমঝদার থাকলে কি আজ আমাকে ওকালতি করে খেতে হত? তা তুমি আমার বাড়িতেই থেকে যাও। সারকাসের সমান মাইনে দেব। কাজকর্ম কিছুই করতে হবে না। শুধু আমার একটু সেবা-টেবা করবে আর কি।"

"সে হবেখন বাবু। এখন আমি বিদেয় হই। অনেক কাজ বাকি।"

উদ্ধববাবু শুয়ে পড়লেন। সিলিং-এর দিকে চেয়ে খুব সাবধানে গলা ঝেড়ে নিয়ে আবার উঠে বসলেন। বাঁ হাতে কান চেপে ধরে নিখুঁত দরবারির মুখ ধরলেন। তারপর আর বাইরের শোক-দুঃখ তাঁকে স্পর্শ করল না।

নতুন চাকরটা নিঃশব্দে বাইরে বেরিয়ে এল। তারপর মৃদু একটা শিস দিল সে। অন্ধকারে আর একটা মূর্তি এগিয়ে এল কাছে। তার দুহাতে ধরা দুটো সাইকেল। দুজনে সাইকেলে চেপে এত জোরে ছুটতে লাগল যে, মোটরগাড়িও পাল্লা দিতে পারবে না।

প্রায় ত্রিশ মাইল রাস্তা একনাগাড়ে সাইকেল চালিয়ে দুজনে যখন কাশিমের চরের কাছাকাছি পৌঁছল তখন এই দুর্দান্ত শীতের রাতেও তারা ঘেমে নেয়ে গেছে। কিন্তু বিশ্রামের সময় নেই। সামনেই একটা জঙ্গল। মরা নদীর খাত। তারপর আবার জঙ্গল।

ঘন ঝোপঝাড়ের মধ্যে সাইকেল লুকিয়ে রেখে দুজনে এবার পায়ে হেঁটে চলতে লাগল। দুজনের মধ্যেই চমৎকার বোঝাপড়া। কেউ কারো সঙ্গে কথা বলছে না, কিছু জিজ্ঞেস করছে না। যেন আগে থেকে প্ল্যান করা আছে এই অভিযান।

দ্বিতীয় জঙ্গলটায় খানিকদূর ঢুকে দুজনে থামল। জিরোতে নয়। অন্ধকার কুয়াশামাখা এই রাতে চারদিকে কিছুই দেখা যায় না। দুজনে তাই পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রাতের শব্দগুলিকে চিনবার চেষ্টা করল। কোন্ শব্দটা প্রাকৃতিক, কোন্‌টা নয়। সন্দেহজনক কিছুই অবশ্য শুনতে পেল না তারা। তবে এরপর সাবধানে এগোতে লাগল।

সামনেই একটা দুর্গের মতো মস্ত বাড়ির কালো ভুতুড়ে আকারটা জেগে উঠছিল কুয়াশার মধ্যেও। একটা জায়গায় সামনের জন থামল। তারপর আস্তে ডাকল, "গবাদা।"

"হুঁ।"

"এই হল সেই জায়গা, যেখানে হরিহর খুন হয়। মনে আছে?"

"খুব মনে আছে।"

"আর সামনে ঐ সেই বাড়ি।"

"জানি।"

দুজনে চুপ করে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। এবার গবা ডাকল, "গোবিন্দ।"

"বলো।"

"হরিহরকে খুন হতে আমি দেখেছি। তবে খুনিকে দেখিনি। আর দেখিনি বলেই সাক্ষিও দিইনি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ভুল করেছি। সাক্ষি দিলে তুই নির্দোষ মানুষ হয়তো খালাস পেতিস।"

গোবিন্দ মাথা নেড়ে বলল, "না, গবাদা। খালাস হলেও ওরা আমাকে ছাড়ত না।

জেলখানাতেও ওদের লোক আছে। বিরাট দল। ফাঁসিতে না-ঝুললেও খুন হতাম।"

দুজনে বাতাসের মতো ফিসফিস করে কথা বলছিল। এত আস্তে যে, চার হাত দূর থেকেও শোনা যায় না।

গবা আর গোবিন্দ আর-একটু এগিয়ে গেল। তারপর গোবিন্দ বলল, "গবাদা, এইবার।"

গবা গলাটা সাফ করে নিল একটু। তারপর হঠাৎ বেশ চেঁচিয়ে গান ধরল: 'আজ মনটা করে উড়ন খুড়ন গা করে আইঢাই। কাশিমের চরে দোঁখ জনমানব নাই। আছেন শুধু বিজ্ঞ পক্ষী, আর যতেক ভক্তজন। ইংগিতে কয় কথা পাখি, তা বুঝেছেন কজন। আয় রে যত নন্দীভৃঙ্গী, তোদের ডাকে হরিহর। পাখির পেটে কথা করে খচরমচর। আছেন গুরু আছেন জ্ঞান, কিন্তু শিষ্য নাই। বিজ্ঞ পক্ষী গোমড়া মুখে বসে থাকেন তাই।'

গান শেষ হলে দুজনে উৎকর্ণ হয়ে বসে থাকে। অনেকক্ষণ কেটে যায়।

গোবিন্দ বলে, "ওরা বোধহয় এদিকে আসেনি গবাদা।"

গবা হঠাৎ ঠোঁটে আঙুল তোলে।

কাছে-পিঠে জঙ্গলের মধ্যে সড়সড় শব্দ হয় একটু। নিঃশব্দ পদসঞ্চারে কে বা কারা আসছে।

(ক্রমশ)

ডাইনোসর-বংশ কি লুপ্ত হয়ে গেছে? নাকি এই বিশ শতকের পৃথিবীতেও বেঁচে আছে সেই প্রাগৈতিহাসিক অতিকায় প্রাণী? প্রশ্নটার উত্তর খুঁজতে গত মাসে এক মারকিন অভিযাত্রী-দল কঙ্গোয় গিয়েছেন। তাঁদের খবর প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকায়। পরে কলকাতার স্টেটসম্যান পত্রিকাতেও এই বিষয়ে মস্ত লেখা বার হয়। কঙ্গোর অরণ্য-অঞ্চলের অধিবাসীরা বলে, মোকেলে-ম্‌বেম্বে (অর্থাৎ ডাইনোসর) আজও বেঁচে আছে।

শঙ্কুর কঙ্গো-অভিযান

বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, সত্যজিৎ রায় সম্প্রতি বিজ্ঞানী শঙ্কুকে নিয়ে যে উপন্যাস লিখেছেন, তারও পটভূমি কঙ্গো, এবং সেই উপন্যাসেরও কেন্দ্রে রয়েছে একটি সুবিশাল মোকেলে-ম্‌বেম্বে। এক্ষেত্রে এটি ডাইনোসর-বংশের সবচেয়ে হিংস্র সদস্য—টির‍্যানোসরাস। একটু ধৈর্য ধরো তোমরা। আর তো মাত্র কয়েকটা দিন। তারপরেই পূজাবার্ষিকী আনন্দমেলা বেরুচ্ছে। আর তাতেই থাকছে সত্যজিৎ রায়ের সেই দারুণ রোমাঞ্চকর উপন্যাস—শঙ্কুর কঙ্গো-অভিযান।

নতুন

প্রস্তুত হ'ল

প্রেস্টীজ

১০০% সুরক্ষিত

Patent pending

এক অতি অপূর্ব 'গ্যাসকেট রিলিজ সিস্টেম' দ্বারা সর্বাধিক সুরক্ষা-পূর্ণ প্রেসার কুকার।

যখন খাদ্য-কণা ওয়েট ভাল্বকে বন্ধ ক'রে দেয় তখন কুকারের মধ্যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রেসার সৃষ্টি হয়। সেইসময় আপনার সুরক্ষা নির্ভর করে কেবলমাত্র সেফটি প্লাগ-এর উপর। কিন্তু আপনি কি ঠিক চিনতে পারবেন- কোনটি আসল বা কোনটি নকল? যদি প্লাগটি নকল হয় তার ফলে কি ঘটতে পারে তা-ও আপনি জানেন না।

তাই, পূর্ণ সুরক্ষা-র বিশেষ প্রশ্নটি চিন্তাধারায় রেখে-ই আমরা তৈরী করলাম এই নতুন প্রেস্টীজ! এর অপূর্ব্ব 'গাসকেট রিলিজ সিস্টেম' আপনার প্রেসার কুকারকে যে কোনো অবস্থায় নিশ্চিতভাবে সুরক্ষিত রাখবে; সেফটি প্লাগ-টি হ'য়ে যাবে অপ্রয়োজনীয়।

অপূর্ব্ব 'গাসকেট রিলিজ সিস্টেম'—কিভাবে নতুন প্রেস্টীজ-কে ১০০% সুরক্ষা করে

সেফটি প্লাগ উড়ে যাওয়ার অনেক আগেই 'গাসকেট রিলিজ সিস্টেম' অনাবশ্যক ভাপ-কে ধীরে ধীরে সুরক্ষার সঙ্গে বার করে দেয়। কুকারের বিভিন্ন 'পার্টস' নকল বা পুরানো হলেও নির্ভরযোগ্য এই 'গাসকেট রিলিজ সিস্টেম' ঠিকমত কাজ চালিয়ে যায় —সদাসর্বদা!

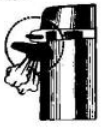

নতুন প্রেস্টীজ অধিক সুবিধাজনক

গাসকেট দ্বারা ভাপ বেরিয়ে আসার পর গাসকেট-টিকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিন; মুহূর্ত্তের মধ্যেই আপনার কুকার আবার কাজে প্রস্তুত!

সেফটি প্লাগ-এর আর প্রয়োজনীয়তা নেই—তাই এটিকে বারবার বদলান-র ঝঞ্ঝাট বা নকল-এর চিন্তা থাকল না।

নতুন প্রেস্টীজ অনেক বেশী টেকসই

অনাবশ্যক ভাপ-চাপকে বিপদ সীমা-য় পৌঁছাতে দেওয়া হয় না; তাই কুকারের সাধারণ টুট-ফুট অনেক কম। অতএব, নতুন প্রেস্টীজ অবশ্যই অন্য কুকারের তুলনায় টেকসই।

নতুন প্রেস্টীজ-এর অন্যান্য লাভ

* অধিক টেকসই মোটা 'তল'
* স্টেনলেস স্টিল-এর নতুন স্ক্রু সমেত মজবুত হ্যাণ্ডেল
* মজবুতভাবে ধরা-র জায়গা সমেত 'অকৃত্রিলিয়ারী হ্যাণ্ডেল—যা গরম হয়ে যায় না
* দৃঢ় আর মজবুত নতুন 'টিবেট'
* আকর্ষক ঝকঝকে চেহারা
* উপযুক্ত রন্ধন-পুস্তিকা
* ছয়টি সুবিধাজনক সাইজ-এ পাওয়া যায়।
* ১০ বছরের গ্যারান্টী

আর, গত ৩০ বছরে ভারতে সর্ব্বাধিক লোকপ্রিয় প্রেসার কুকার 'প্রেস্টীজ'-এর বৈশিষ্ট্য।

ttk উৎপাদন

Prestige

যারা ভারতে প্রথম প্রেসার কুকার প্রস্তুত করেছে

হারু

তাপস গঙ্গোপাধ্যায়

ব্যাঙ্কের দরজার সামনে এসে হারু হাঁপ ছাড়ল। আর মাত্র চারটে সিঁড়ি। তারপরেই একেবারে পাউরুটির মতো মেঝে। এ-মুড়ো থেকে ও-মুড়ো যত খুশি ঘোরো, টেরও পাবে না। অত বড় লম্বা ঘরটা, একেবারে ঝক-ঝক তক-তক করছে। দেয়াল ঘেঁষে খদ্দেরদের বসার জন্য লম্বা-লম্বা গদি। ওই সব গদির পাশেই রুপোর মতো লোহার চকচকে ফাঁপা নল। সবাই তাতে সিগারেটের ছাই ঝাড়ে, পোড়া দেশলাই-কাঠি, কাগজের টুকরো ফেলে। তারপর যেই মানুষ-সমান উঁচু কাঠের দেয়ালের ওধার থেকে বাবুরা চেঁচিয়ে নম্বর হাঁকেন, অমনি লোকগুলি হুড়মুড় করে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে লোহার ঝাঁঝরির ভেতর হাত গলিয়ে কী একটা চাকতিমতো বাড়িয়ে দিয়ে বলে, এই আমার। বাবুরা ওই চাকতি নিয়ে গুনে-গুনে বড়-বড় নোট থাক করে দিয়ে দেন। হারু কতদিন ওই গুনতি-বাবুদের চায়ের খালি গ্লাস নেওয়ার সময় চেয়ারের তলায় চুপ-চাপ বসে ওই বড়-বড় নোটের গন্ধ বুক ভরে টেনে নিয়েছে। জগাইদা বলেছে, আর তিনটে মাস হারুর 'টেরাল'। ওই 'টেরালে' পাশ করলে ফি মাসে একটা নোট দেবেন। ওই একটা নোট ভাঙালেই দশ-দশটা টাকা।

খুপরি-কাটা কাঠের দোলনায় আট গ্লাস চা, ফাঁকে-ফাঁকে খবরের কাগজে মোড়া আটজোড়া চিনি-টোস। ব্যাঙ্কের আটজন বাবু জগাইদার খদ্দের। রোজ একটার সময় জগাইদা ওর ডান হাতে এই কাঠের দোলনাটা ঝুলিয়ে দিয়ে বলেন, 'যা ব্যাঙ্কে দিয়ায়।'

মোড়ের মাথা থেকে ব্যাঙ্কের এই সিঁড়ি, হারু গুনে দেখেছে ওর ঠিক একশো দশ হাঁটু লাগে। কাঠের দোলনাটা পয়লা সিঁড়ির এক কোণে রেখে আস্তে ঘুরে গিয়ে পিঠটা ঠেকাল সিঁড়ির গায়ে। বাঁ হাঁটুর মাথা থেকে দড়ি দিয়ে বাঁধা কাটা টায়ারের টুকরোটা একদম পাশে সরে গিয়েছে। তাই এত লাগছিল। খানিকটা ছাল উঠে গিয়েছে। দু হাত দিয়ে টায়ার-টুকরোটা ঘুরিয়ে আবার হাঁটুর মাথায় টেনে দিল। ডান হাঁটুরটা ঠিক আছে। ছেঁড়া খাকি হাফ প্যান্টের তলায় হাঁটুর ঠিক নীচেই উনুন খোঁচানো একজোড়া শিক। কালো, কী সরু রে বাবা! নিজেরই অবাক লাগে হারুর। অথচ হাতদুটো ওর যেন পাথুরে কয়লা। রাস্তায় রাস্তায়

আমাদের কথা

আমরা কেউ ভালবাসি রূপকথা,

কেউ অ্যাডভেনচার,
কেউ পড়ি শিকার
কাহিনী, কেউ কল্পবিজ্ঞান, কারো ভাল লাগে জীবনী, কারো

পুরনো কলকাতা,
কেউ চাই ছড়া
আর কবিতা,

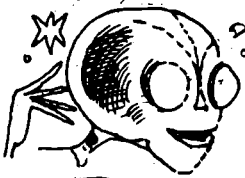

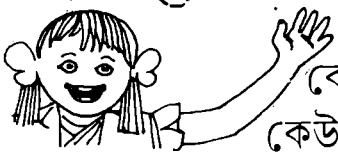

কেউ শিখতে চাই ছন্দ, কেউ বানান,
কেউ থাকি বিজ্ঞানের মজায়,

কেউ ভূতের গল্প, হাসির গল্প

ছাড়া ছুঁই না কেউ,
কেউ গোয়েন্দাগল্প
ছাড়া ছুঁয়েও দেখি না।

আমাদের নানান বয়েস, নানান রকমের পছন্দ আর

আমাদের সব-রকম পছন্দের বই যাঁরা ছাপেন তাঁদের নাম
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯ ফোন ৩৪ ৪৩৬২

ফুটপাথে-ফুটপাথে এই দুটো হাত নিয়েই তো দোকানে-দোকানে চা, চিনি-টোস দিয়ে আসে। কোনো কষ্ট নেই।

"কী রে, শুয়ে পড়লি যে বড় ?"

বড় দারোয়ানজির গলা। হারু ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল। সিঁড়ির ওপরে লোহার দরজার গায়ে টুলের ওপর বসে আছেন দারোয়ানজি। ধবধবে সাদা ফুল-প্যান্ট, সাদা হাত-বন্ধ শার্ট। কোমরে চওড়া বেল্টের মুখটায় পেতলের একটা মাছ। বুকের ওপর আড়া-আড়ি ভাবে পাতা গুলির বেল্ট। পাকানো এক জোড়া গোঁফ। কালো বুট পরা পায়ের ফাঁকে উরুর ওপর হেলানো বন্দুক। দারোয়ানজি খৈনি ডলতে-ডলতে গোঁফ নাচাচ্ছেন।

কয়েক জোড়া ধুতিতে জড়ানো, প্যান্টেমোড়া পা দারোয়ানজির মুখটা আড়াল করল। পায়ের ভিড়টা হালকা হতেই, ডান হাতে দোলনাটা ঝুলিয়ে বাঁ হাত আর দুই হাঁটু ঘষে সিঁড়ি ডিঙোতে-ডিঙোতে হারু বলল, "শুইনি তো। এই তো যাচ্ছি।"

"আজ টিফিন কী রে ?"

"চিনি-টোস আর চা দারোয়ানজি।"

"জগাইকে বলিস আমায় যেন পাঠায়। দাম দেব না। দুটোর মধ্যে আসবি। নইলে আর কোনোদিন ঢুকতে দেব না।"

লোহার দরজাটা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতে-ঢুকতে হারু ভাবল, এ-কথা শুনলে জগাইদা দূর করে দেবে। আজ কুচোচিংড়ি দিয়ে লালশাক রান্না করেছে জগাইদা। আজ এক থালা ভাত দেবে। জিভে জল এসে গেল। বরং কাল দুপুরে আসার সময় দারোয়ানজির জন্য এক জোড়া চিনি-টোস লুকিয়ে নিয়ে আসবে। জগাইদা যখন চা বানাবে, তখন প্যান্টের পকেটে গুঁজে নেবে। ডানদিকের পকেটটা এখনো আস্ত।

এই সময়টা ব্যাঙ্কে বড্ড ভিড়। ঠিক যেন ফুটপাথ। তবে ফুটপাথের মতো এবড়ো-খেবড়ো,কাদা-জলে মাখামাখি বা ইঁট-পাথরে খোঁদলানো নয়। ঠিক পাউরুটি। এই নরম পাউরুটির ওপর দিয়ে জোড়া-জোড়া মোটা, রোগা পা যেন ছুটছে। বুট, স্যাণ্ডেল, শাড়ি, ফুলপ্যান্ট, ধুতি। আহ্ কী সুন্দর গন্ধ! ইচ্ছে হল গন্ধটা আর একবার টেনে নেয়।

কাঠের পার্টিশনের ফাঁক দিয়ে গলে টেবিলের তলা দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে হারু চা আর চিনি-টোস বাড়িয়ে দিতে লাগল। চেকবাবু,সই-মেলানো বাবু, গুনতি-বাবুরা বড় ভাল। হেসে কথা বলেন। যত ভয় ওর ক্যাশবাবুকে। হারুকে দেখলেই খিঁচিয়ে ওঠেন। বলেন, "আবার অপয়াটা এসেছে।" একদিন সই-মেলানোবাবুর কাছ থেকে ও জেনে নেবে অপয়াটা আবার কী জিনিস ?

"কী রে, জগাই আবার চিনি-টোস্ট পাঠাল ? সকালে যে বলে এলাম মরিচ-টোস্ট।" চেকবাবুর টিফিন মনের মতো হয়নি। জগাইদা ভুলে গিয়েছে। যদি চেকবাবু ফেরত দেয় তাহলে জগাইদা ওকে মারবে। দূর করে দেবে। চিংড়ি-লালশাক দিয়ে ভাত—কিছুতেই দেবে না।

আবার ওকে উলটো দিকের ফুটপাথে বাস, মিনিবাসের লাইনে ঘুরে ঘুরে ভিক্ষে করতে হবে।

"অ্যাই, কাল যে তোকে দুটো টাকা দিয়ে বললাম বর্ণপরিচয় কিনে আনবি—এনেছিস ?"

সই-মেলানো ফর্সাবাবু চেকবাবুর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। এবার দুই বাবু নিজেদের মধ্যে গল্প করবেন। চা খাবেন, 'টোস' খাবেন। খদ্দেররা ওধার থেকে চেঁচামেচি করবেন। হারু ডান হাত দিয়ে কাগজে মোড়া 'টোস'জোড়া উঁচুতে তুলে ধরল। সইবাবু হাত বাড়িয়ে নিলেন। "উত্তর দিলি না যে ?"

চেকবাবুর গলাটা নরম। তাহলে রাগ নেই। হারু ভয়ে-ভয়ে দাঁত বার করে একটু হাসল। শুনতে পেল ফর্সা সইবাবু বলছেন, "একেবারে ক্যালেণ্ডারের হামা-দেওয়া গোপাল। "অ্যাই হারু, পালাচ্ছিস যে। টাকা নিয়ে করলি কী ?"

ঘষটাতে-ঘষটাতে আর একটা টেবিল পেরোতে পেরোতে বাঁ দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে ফিক করে হেসে হারু বলল, "ক্যাশবাবুকে চাটা দিয়ে আসছি বাবু।"

সামনের টেবিলের ওধারেই ক্যাশবাবু। ঘাড় অবধি বাবরি চুল। কপালে সিঁদুরের লম্বা টানা দাগ। শক্ত চোয়াল। কুচকুচে কালো মুখে ফ্যাকফ্যাকে সাদা ঠোঁটের কষে পানের রস। হারু হাত বাড়িয়ে চায়ের গ্লাসটা টেবিলে রাখতে গিয়ে শুনল ক্যাশবাবু বলছেন, "ঠিক কাজের সময় অপয়াটা আসবে।"

চিনি-টোসজোড়া টেবিলে রাখতে গিয়েও

কাপড় শেষবার ধোবার আগে জলে একটু রানীপাল মেশান আর এবার দেখুন কাপড়ের ঝকঝকে সাদা ! রানীপালের সাদা ! সাদা কাপড় সে যাই হোক না কেন সুতী, সিন্থেটিক আর ব্লেণ্ডেড-রানীপাল ব্যবহারে ঝকঝকে হয়ে উঠবেই ।

নিয়মিত রানীপাল লাগান... আর সাদা কাকে বলে দেখুন ও দেখান

সুতীর কাপড়ের জন্য **রানীপাল®**
সিন্থেটিক ও ব্লেণ্ডেড কাপড়ের
জন্য **রানীপাল®-এস**

Shilpi SG-2A/78 Ben

হারুর হাত কেঁপে গেল। ক্যাশবাবু উঠে দাঁড়িয়েছেন। সাদা ধুতির ওপর হাফ-হাতা লাল পাঞ্জাবিতে ঠিক যেন পুরুত-ঠাকুর। এখুনি পাঁঠা বলির মন্ত্র পড়বেন। ও কী, হাত তুলছেন কেন? মারবেন নাকি? দু হাত তুললেন? রাগী চোখজোড়া মনে হচ্ছে এখুনি জলে গলে যাবে। কে যেন হারুর পেছনে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় গজরাচ্ছে, "হানডাপ্, হানডাপ্। হাত তোল্। গুলি মেরে খুলি উড়িয়ে দেব।"

ভয়ে টেবিলের তলায় সিঁধিয়ে গেল হারু আর তখনই টের পেল গোটা ব্যাঙ্কটা যেন হঠাৎ মরে গেছে। ওই তো চেকবাবু, ফরসা সইবাবু, গুনতিবাবুরা। যে যার টেবিলের সামনে হাত তুলে দাঁড়িয়ে। পাঁচ -ছটা লোক ওদের সামনে। এক-এক জনের হাতে পিস্তল, ভোজালি, লম্বা-লম্বা ছুরি। ঠিক ওর সামনে যে লোকটা, তার ডান হাতে পিস্তল। লোকটা বাঁ হাত দিয়ে এক ঝটকায় ক্যাশবাবুর টেবিলের সব কাগজপত্র ফেলে দিয়ে হুঙ্কার ছাড়ল, "চাবি কোথায়? চাবি দে। দশ গুনব, এর মধ্যে চাবি না দিলে—।"

কী করবে লোকটা? ক্যাশবাবুকে কি খুন করবে? টেবিলের তলায় বসে ক্যাশবাবুকে দেখতে পাচ্ছে না হারু। ক্যাশবাবুর ধুতির কোঁচা ঝুলছে। পা দুটো ঠক-ঠক করে কাঁপছে। তবে কি ক্যাশবাবুও ভয় পান? সবাই কেন চুপ? কেউ কোনো কথা বলছে না কেন? বড় দারোয়ানজি, ছোট দারোয়ানজি কোথায়? ওরা বন্দুক তুললেই তো—। শুনতে পেল খুব কাছেই দাঁত চেপে নম্বর গুনতি হচ্ছে—পাঁচ, ছয়, সাত...।

এর পরেই তো গুলি চলবে। যেমন রোজ রাতে মোড়ের মাথায় চলে। জগাইদার ঝাঁপ-বন্ধ দোকানের ভেতর শুয়ে-শুয়ে রাতভর গুলি, বোমার শব্দ শুনতে-শুনতেই ওর চোখের পাতা ভারী হয়ে আসে। পুলিসের গাড়ি আসে। রাস্তায় মটমট আওয়াজ ওঠে। জগাইদার বন্ধ ঝাঁপে দমাস-দমাস লাথি পড়ে। কারা যেন বলে, এই স্টলগুলোই যত বদমাইশির ঘাঁটি। এগুলো না ভাঙলে মাস্তানি বন্ধ হবে না। আবার লাথি।

সত্যিই ভেঙে দেবে? তাহলে কে ওকে সকালে চা আর লেড়ো বিস্কুট খেতে দেবে? আর পারল না, হারু ঝাঁপিয়ে পড়ল। পাথুরে কয়লার মতো শক্ত হাত দুটো দশ গোনার মাথায় সামনে দাঁড়ানো পা দুটোকে ধরে প্রাণপণে দিল টান। লোকটা হারুকে নিশ্চয় দেখতে পায়নি। একদম উলটে পড়ল। ফটাস করে একটা গুলি মাথার ওপর ফ্যানে গিয়ে লাগল। একটা লম্বা শক্ত পা সেই মুহূর্তে হারুর মুখটাকে থেঁতলে দিল।

উলটে টেবিলের ওধারে গড়িয়ে যাওয়ার আগে আর একটা ফটাস। শব্দটা শেষ হওয়ার আগেই মনে হল ওর বাঁ হাঁটুটা গুঁড়ো হয়ে গেল। বাঁ হাঁটুর নীচের সেই লোহার শিকটা টুপ করে খসে গেল। অথচ কোনো যন্ত্রণা নেই। মাথাটা ভীষণ ঘুরছে। বড় ঘুম পাচ্ছে। অথচ জেগে থাকা দরকার। অনেক দূর থেকে কারা যেন বলছে, "ধর, ধর। ছাড়ব না একটাকেও। গেটটা টেনে দে। দারোয়ানজি, দারোয়ানজি...।"

হারুর মনে হল মরা ব্যাঙ্কটা আবার জ্যান্ত হয়ে উঠেছে। কারা যেন খুব ছোটাছুটি করছে। চিৎকার, চেঁচামেচি সব তালগোল পাকিয়ে আস্তে-আস্তে দূরে বহু দূরে সরে যাচ্ছে। কে যেন খুব আস্তে-আস্তে ওর মাথার নীচে হাত রাখছে। বড় ঘুম পাচ্ছে। না, ঘুমোলে চলবে না। জগাইদা জানতে পারলে রেগে যাবেন। যে করেই হোক জেগে থাকতে হবে।

কতক্ষণ বাদে হারু জানে না, শুধু ঘুমিয়ে পড়ার আগে ও টের পেল, কে যেন ওকে কোলে করে একটা গাড়ির ভেতর তুলল। দু দিকে অসংখ্য ছায়া। ওগুলো ছায়া না মুখ? কারা যেন বলছে, 'ইশ্ রক্তে ভেসে যাচ্ছে।'

আবার কে যেন বলল, "এ তো সেই খোঁড়াটা। বারো-তেরো বছর বয়স বড়জোর। ইশ্, টেঁসে গেল।"

ঠিক সেই মুহূর্তে যে হাত ওকে কোলে তুলে আদর করতে করতে ছায়া-ছায়া মুখের ভিড় সরিয়ে গাড়ির ভেতর নিয়ে গেল, সেই হাত দুটোই যেন ফুঁপিয়ে উঠল—"দেখুন ক্যাশিয়ারদা যাকে রোজ অপয়া বলেন, সেই অপয়াটাই চলে যাচ্ছে।"

কার হাত? ফর্সা সইবাবুর?

বিড়বিড় করে পাশ থেকে একটা রুক্ষ গলা অনেক কষ্টে একটা হেঁচকি তুলল—"ও ফিরবেই। দেখিস। ফিরিয়ে আনবই আমরা।"

হারু আর শুনতে পেল না।

ছবি রতন সেন

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

গাবলু
ললিপপ
শিগগির ভাগ দে!

ছবিতে স্বরধ্বনির অঙ্ক

বাচস্পতি

হিগিনকাকু বললেন, "কথাটা হল, একটা স্বরধ্বনিকে বোঝানোর জন্যে অত কথা খরচ করব কেন? ধরো তোমার নাম ভণ্টু। এখন কারো সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিতে গেলে আমি কি বলব যে, 'ইনি শ্রীমান ভণ্টু, ইনি একটি মানবশিশু? কিংবা ইনি একটি প্রাণি-বিশেষ?' আরে নামটাই তো বলে দিচ্ছে তুমি কী, জ্যান্ত মানুষ, না টেবিল-চেয়ার। জড় পদার্থের কি ভণ্টু নাম হয়?"

ভণ্টু বলল, "তা স্বরধ্বনিগুলোকে আরো কম কথায় কী করে বোঝাবে?"

"এক নম্বর, ঠোঁট কী করছে, তার হিসেব রাখার কিচ্ছু দরকার নেই বাংলা স্বরধ্বনির বেলায়। শুধু জিভের কাজ দ্যাখো।"

ভণ্টু বলল, "তা হলে জিভের কাজ অনুযায়ী ঐ ওপরে, নীচে, মধ্যে, সামনে, পেছনে এইভাবে স্বরধ্বনির ভাগ করতে হবে তো?"

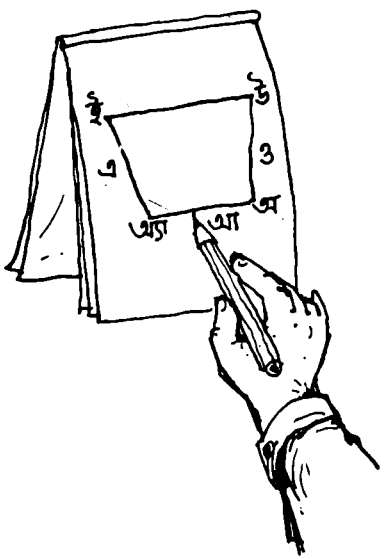

"ইগজ্যাক্‌টলি! সোনা ছেলে!" বলে মুগ্ধ চোখে খানিকক্ষণ ভণ্টুর দিকে তাকিয়ে রইলেন হিগিনকাকু। তারপর বললেন, "কিন্তু আমরা তো 'প্লাস-মাইনাস' চিহ্ন ব্যবহার করছি।"

ভণ্টু বলল, "বড্ডো অঙ্কের মতো হয়ে যাচ্ছে।"

"যাঃ, যোগবিয়োগ আবার একটা অঙ্ক নাকি?" হিগিনকাকু মৃদু ধমকে দিলেন। "এবার বলো তাহলে 'ই'-টা কী ধরনের স্বরধ্বনি।"

ভণ্টু খাতা সামনে ধরে বলল, " + ওপরে, + সামনে?"

"ঠিক। কিন্তু একটু সাধুভাষায় ভদ্রলোকের মতো বল্ বাবা!"

ভণ্টু বলে গেল, " 'ই'-টা + উর্ধ্ব, +সম্মুখ; 'উ' হল + উর্ধ্ব, + পশ্চাৎ; 'অ্যা' + নিম্ন, + সম্মুখ; 'অ' + নিম্ন, + পশ্চাৎ; 'এ' + মধ্য, + সম্মুখ—"

হিগিনকাকু বাধা দিয়ে বললেন, "আরে বাবা, 'মধ্য' নামে বাড়তি কথাটা এখানে ঢোকানোর দরকার কী? বলো না –উর্ধ্ব, –নিম্ন! তাহলেই তো 'মধ্য' বোঝাবে, তাই না? 'মাইনাস উর্ধ্ব' মানে ওপরে নয়; 'মাইনাস নিম্ন' মানে নীচে নয়। তার মানেই মাঝখানে!"

ভণ্টু বলল, " 'ও' তাহলে –উর্ধ্ব, –নিম্ন, + পশ্চাৎ?"

"একশোবার! আর বাকি রইল 'আ'। সেটা কী হবে?"

ভণ্টু ভাবতে লাগল। 'আ'-র বেলায় জিভ এগুচ্ছে না, পিছোচ্ছে না, উঠছে না। "তাহলে কি + নিম্ন, –সম্মুখ, –পশ্চাৎ?"

"অর্জুনের লক্ষ্যভেদ" বলে লাফিয়ে উঠলেন হিগিনকাকু। তারপর খাতায় বাঁ পাশের এই ছবিটা এঁকে বললেন, "ধর্!"

ভণ্টু জিজ্ঞেস করল, "এটা কী?"

"এতে তুমি স্বরধ্বনিগুলোর যা হিসেব দিলে সেটাই ছবিতে ধরা আছে। বাঁ দিকটা 'সম্মুখ' আর ডানদিকটা পশ্চাৎ। 'ওপরে' 'নীচে' তো দেখতেই পাচ্ছ। এই ছবিটা বুকের ভেতরে বসিয়ে নাও, হনুমান যেমন রামসীতার ছবি রেখেছিল। সামনের বার থেকে উচ্চারণের খেলা শুরু হবে।"

(ক্রমশ)

নিমন্ত্রণ

প্রসাদ

আজ বাড়িতে একটু বিশেষ রকমের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা। বাবার একজন ডাক্তার বন্ধু অনেক বছর বিদেশে কাটিয়ে সদ্য দেশে ফিরেছেন। সপরিবারে আজ তাঁর নিমন্ত্রণ। কী যেন একটা রান্না মা উনুনে চাপিয়েছেন। বসবার ঘরেও তার সুঘ্রাণ মাঝে-মাঝে ভেসে আসছে। বাবা সেখানে বসে বসে ক্রসওয়ার্ড করছেন। হঠাৎ গন্ধ পেয়ে যেন তাঁর চমক ভাঙল।

"Ah, the dinner smells good." he says.

The clock on the wall strikes seven.

Milly is sitting on the carpet on the floor.

Every now and then she's rubbing the carpet with her hand.

It feels so soft and smooth.

Mummy comes in from the kitchen.

"Dinner is almost ready," she declares.

Milly grows impatient for the arrival of the guests.

"I wish they'd come now," says she.

Just then there's the sound of a car outside.

"It sounds like them," Milly cries and jumps up.

প্রায় ন'টা বাজে। খাওয়া-দাওয়া একটু আগেই শেষ হয়েছে। খাবার জিনিস কী কী ছিল, জানতে চাইছ? বলতে গেলেই জিভে জল আসবে, কাজেই সে-কথা থাক। বরং খাওয়ার পর কী কথাবার্তা হয়েছিল তাই শোনা যাক। তার থেকে খানিকটা আঁচ পাওয়া যাবে।

Dr. Palit was full of praise for the dinner.

"The hilsa tasted delicious," he said.

"It's ages since we tasted anything like it," Mrs. Palit added.

"And the prawn, Mummy?" cried Bharat, their eleven-year old son, "Wasn't it exciting?"

"You sound excited all right," Mrs. Palit replied.

Thirteen-year old Ram looked at his younger brother with pity. "Can't keep his balance, poor chap." he thought.

If his opinion about the dinner had been sought he'd merely have said, "It was all right."

The youngest, Sumitra, aged seven, had been drawn to the flowers on the table.

"Look Mummy!" she cried out, "Lovely roses. They smell so sweet."

And Mrs. Ray was thinking all the while, "It's a real pleasure to have guests like this family. They make all your efforts worthwhile."

লক্ষ করো :

The dinner smells good.
The fish tastes delicious.
The carpet feels smooth and soft.
The roses smell sweet.

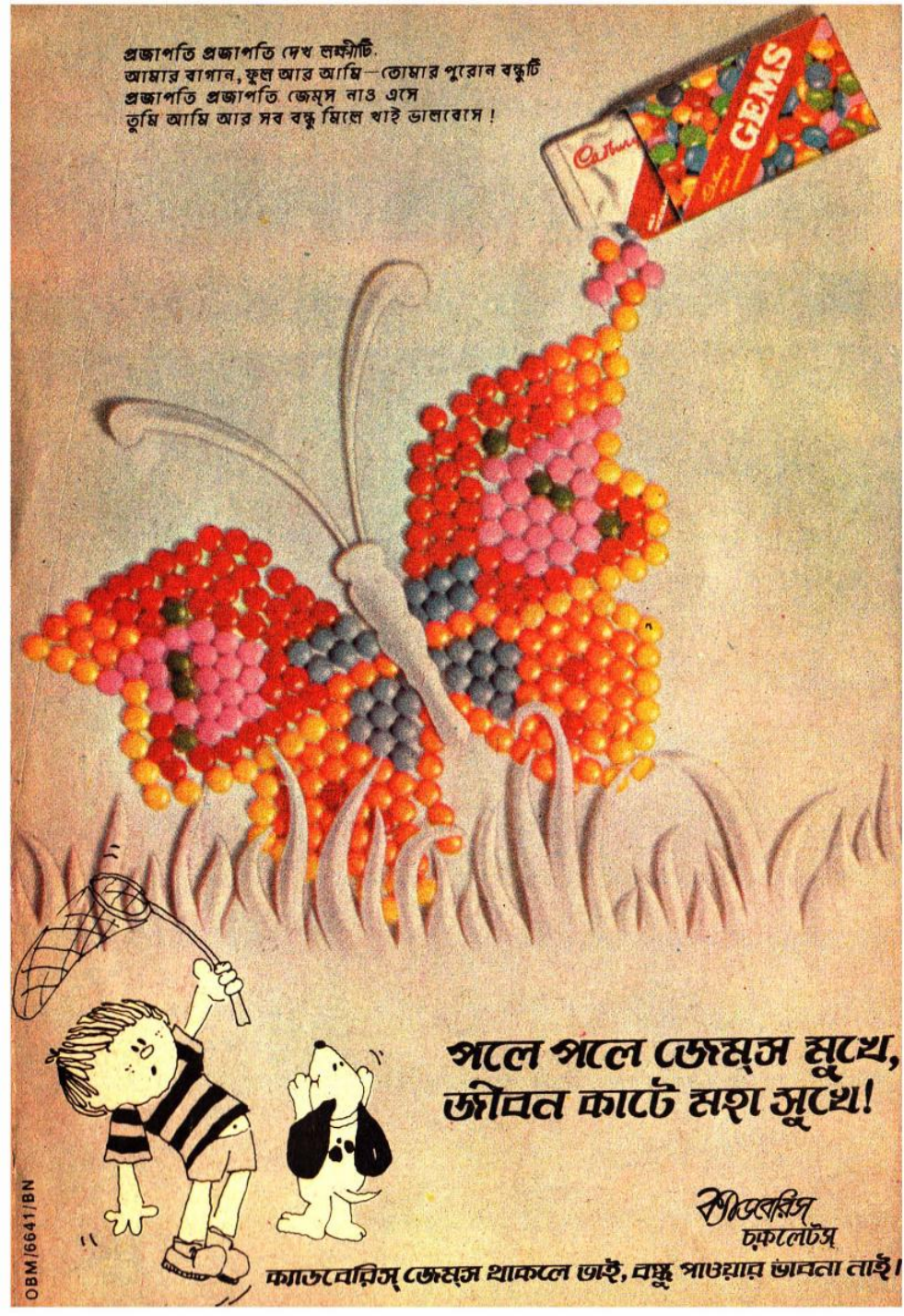

প্রজাপতি প্রজাপতি দেখ লক্ষ্মীটি.
আমার বাগান, ফুল আর আমি—তোমার পুরোন বন্ধুটি
প্রজাপতি প্রজাপতি জেম্‌স নাও এসে
তুমি আমি আর সব বন্ধু মিলে খাই ভালবেসে !
Cadbury
GEMS
পলে পলে জেম্‌স মুখে,
জীবন কাটে মহা সুখে!
ক্যাডবেরিস
চকলেটস
ক্যাডবেরিস্ জেম্‌স থাকলে ভাই, বন্ধু পাওয়ার ভাবনা নাই।
OBM/6641/BN

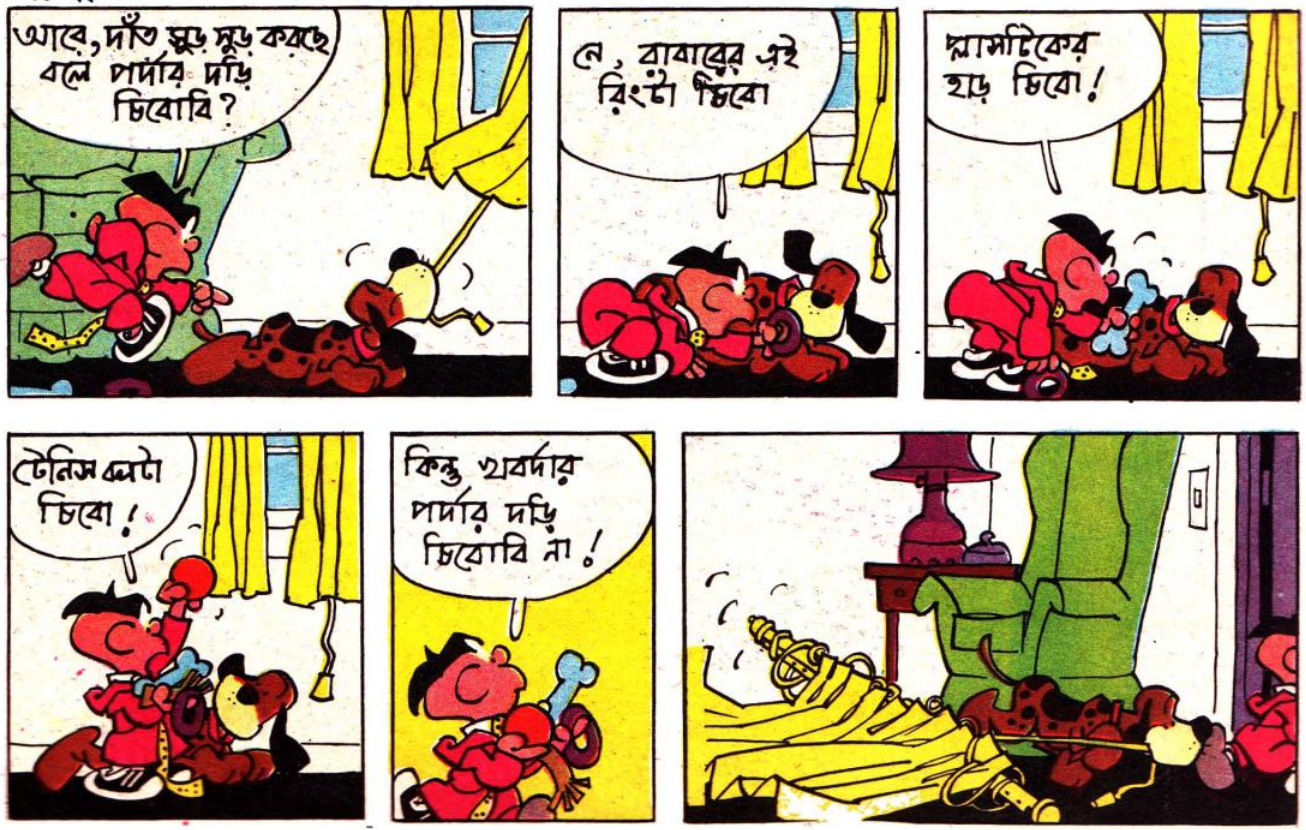
আরে, দাঁত সুড় সুড় করছে বলে পর্দার দড়ি চিবোবি?
নে, বাবার এই রিংটা চিবো
প্লাস্টিকের হাড় চিবো!
টেনিস বলটা চিবো!
কিন্তু খবর্দার পর্দার দড়ি চিবোবি না!

ডিম থেকে পাখি

নানান ভাবে, নানান ভঙ্গিতে ডিম থেকে পাখির নমুনা তোমাদের দেখিয়েছি। এবার দ্যাখো সামান্য রেখার হেরফেরে পাখি কেমন তার নিজের রূপে ধরা দিচ্ছে।

—রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

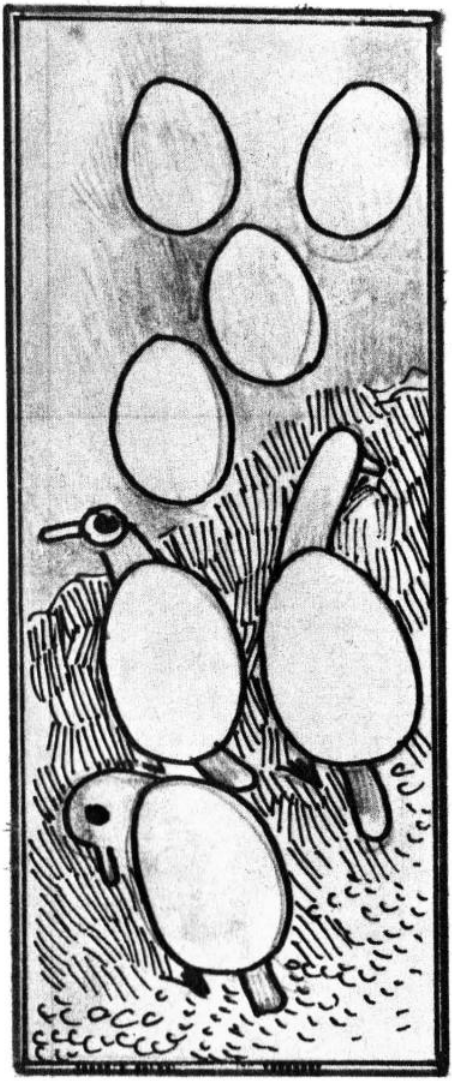

কার্ডবোর্ডের কাজঃ ঝোলানো বাক্স

তোমার দরকারমতো মাপের বোর্ড নিয়ে নমুনায় দেখানো নকশার মতো একটা ছক করে নাও। ক-খ-গ-ঘ চৌকোর চারপাশে দরকারমতো চওড়া দাগ দেবার পর যে চৌকো বের হবে তাকে ছ-কোনায় ভাগ করে নাও (৪ নং নমুনায় লক্ষ করো), ওপরের ৩ নং অংশটিকে নমুনামাফিক পাঁচ কোনায় ভাগ করে বোর্ডের পড়ে থাকা অন্যান্য কালো অংশগুলোকে ছেঁটে বাদ দিলেই বাক্সর ফর্মা তোমার হাতে আসবে। এবার ফোঁটা ফোঁটা দাগ-বরাবর চাপ দিয়ে ভাঁজ দেবার আগে ১ নং চৌকো দুটির দুটি পাশই চিরে নিয়ে পরপর ভাঁজ দিয়ে আঠা দিয়ে জুড়লেই ঝোলানো বাক্স তৈরি।

জেনে রাখো—২ নং অংশটুকু ৩ নং অংশের পিছন দিকে আটকালে দেখতে সুন্দর হবে। টাঙাবার জন্য প্রয়োজনমতো ফুটো করতে ভুলো না।

—কারিগর

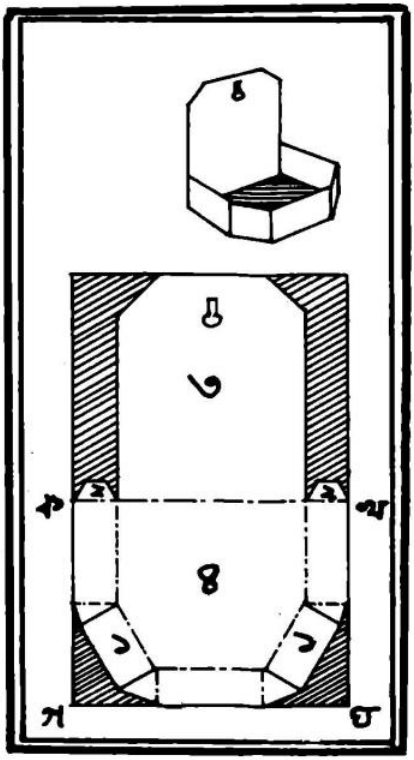

সুপার রিন-এর শুভ্রতার অধিক চমক

অন্য যে কোনো ডিটারজেন্ট টয়লেট বা বারের চেয়ে অনেক বেশী!

সুপার রিন-এর নিয়মিত ব্যবহার আপনার জামাকাপড়ের চেহারাকে পাল্টে এমনই চমকদার করে তুলবে যা দূর থেকেও নজরে পড়বে!

সুপার রিন—অন্য যে কোনো ডিটারজেন্ট পাউডার বা বারে কাচা কাপড়ের চেয়ে অনেক বেশী ঝকঝকে সাদা ক'রে ধোয়। কারণ, সুপার রিন-এর শুভ্রতা আনার শক্তি যে অনেক বেশী!

চাক্ষুষ প্রমাণ করে নিন:

অন্য যে কোনো ডিটারজেন্ট বারে ধোয়া

সুপার রিন-এ ধোয়া

সুপার রিন-এ আছে শুভ্রতা আনার অনেক বেশী শক্তি!

হিন্দুস্থান লিভারের এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিনটাস-RIN.40-1810 BG

পার্লে পপিন্স-চাখবার আগে, রূপোলী স্ট্রাইপটি দেখে নাও আগে-ভাগে।
এখন জালিয়াতদের কোনো চালাকি চলবে না।

everest/81/PP/102-bn